মুর্শিদা বিন্‌তে রহমান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকা

বিশ শতকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হলো বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এই ঢেউ এর তরঙ্গ স্বরুপ। এ দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে প্রগতিশীল ধ্যান ধারণার চর্চা হয় তা যেমন পাকিস্তানের দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও তথাকথিত মুসলিম জাতীয়তাবাদকে নাকচ করে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ রচনা করে, তেমনি তা পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতির বিপরীতে সমাজতন্ত্র অভিমুখীন প্রগতিশীল অর্থনৈতিক সামাজিক বিকাশের পথ নির্দেশ করে। আর এ কারণেই স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র-এ চারটি মূলনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।[১] অবশ্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে প্রতিটি কমিউনিস্ট দল ও গ্রুপ একই অবস্থান থেকে বিবেচনা করেনি। বরং মুক্তিযুদ্ধ বিভাজিত কমিউনিস্ট আন্দোলনে আরও বিভাজনের সুর প্রবাহিত করে। আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের রূপটিও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এদেশের মুক্তি সংগ্রামের ঢেউ বিশ্বের কমিউনিস্ট মতানুসারী দেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিশেষত, শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত নীতি, ব্যবস্থা ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতি তাঁর আহ্বান এ সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করে। '৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রভাবে তিনি তাঁর দলের অন্যতম আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রের কথা ঘোষণা করেন। যদিও তাঁর সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদর্শ এক ছিল না তবুও তাঁকে বিবেচনা করা হয় সমাজতন্ত্রের অনুকূলে প্রবাহিত ধারা হিসেবে। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আচরণ দেখে তিনি আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন যে, তারা যেন

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে ঔপনিবেশিকতাবাদ থেকে আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর স্বাধিকার অর্জনের লড়াইয়ের অংশ বলে মনে করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এই আহ্বান বাংলাদেশের গণযুদ্ধকে একটি আন্তর্জাতিক তাৎপর্য দান করে।[২] এমতাবস্থায় বাঙালি জাতির মুক্তির সংগ্রামে কমিউনিস্ট দলগুলোর অবস্থান, তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও মুক্তিযুদ্ধ সফলকাম করতে তাদের পদক্ষেপ কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচিত প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রবন্ধটি আলোচনা করতে গিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কমিউনিস্ট দলগুলোর দলিলপত্র, সমসায়িক সংবাদ-সাময়িকপত্র, কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের স্বাক্ষাতকার ও আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এবং প্রকাশিত গ্রন্থাবলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে কমিউনিস্টদের নীতি নিয়ে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এসকল বিভ্রান্তি নিরসনে মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিও বিভাজিত হয়। উল্লেখ্য, প্রায় পুরো পাকিস্তান আমলে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকায় কমিউনিস্ট পার্টি আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি পরিচালনা করে। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের পার্টির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের পার্টির কোনো যোগাযোগ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনভাবে রাজনীতি পরিচালনা করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় নীতি গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালে পার্টি মস্কোপন্থি ও চীনপন্থি এ দুটোভাগে বিভক্ত হয়। এরপর চীনপন্থিরা আরও বহুধা বিভক্ত হলেও মূলনীতি তাদের একই থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান নিলে চীনপন্থিরা আরও বিভক্ত হয়ে যায় এবং একটি অংশ না চীন না মস্কোপন্থি নীতি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই বিভক্তি সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধের নীতি নির্ধারকদের পক্ষেও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। প্রবন্ধটিতে মুক্তিযুদ্ধে এই বহুধা বিভক্ত কমিউনিস্ট দল ও গ্রুপসমূহের ভূমিকা তুলে ধরা হলো।

২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে শুরু হয় প্রতিরোধ যুদ্ধের। ধীরে ধীরে বাঙালি বিশ্বের একটি সুসজ্জিত ও আধুনিক অস্ত্রের সমন্বয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল বহুমুখী। কমিউনিস্ট দলগুলো যেমন তাদের কেন্দ্রের অবস্থান অনুসারে যুদ্ধে ভূমিকা পালন করে

তেমনি কোনো কোনো অংশ কেন্দ্রীয় দলের তত্ত্বে বিভ্রান্ত হয়ে আঞ্চলিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে পরিচালিত হয়। পাকিস্তানি আক্রমণের বিপরীতে আঞ্চলিক এই গ্রুপগুলোই দেশের অভ্যন্তরে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযোদ্ধারা যখন ভারতে ট্রেনিং নিচ্ছিলেন সে সময় **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র** গ্রুপগুলো প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো অংশ অখণ্ড পাকিস্তানের ধারণাকেই লালন করেন। নিম্নে যুদ্ধক্ষেত্রে কমিউনিস্ট দলগুলোর অবস্থান তুলে ধরা হলোঃ

১. মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি

ক. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ (মো.) এবং ছাত্র ইউনিয়নের সহায়তায় বাংলাদেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চরিত্র ও ধারা গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। কারণ এসময় কমিউনিস্ট পার্টিকে পর্দার অন্তরাল থেকে কাজ করতে হয়। আর প্রকাশ্য কাজের প্রায় সবটাই করে মস্কোপন্থি ন্যাপ।[৩] একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছাত্র ইউনিয়ন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে পার্টির অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অতীতে বাঙালির অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও এ সময় বিভক্তির বেড়াজালে কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভাঙনের পর মস্কোপন্থি পার্টি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও মুক্তির আন্দোলন যখন তার নির্ধারণমূলক পর্বে প্রবেশ করে তখন পার্টি আগের মতো অগ্রবর্তী শক্তির ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তাছাড়া মস্কোপন্থি কমিউনিস্টদের মধ্যে নানা কারণে 'আওয়ামী নির্ভরতা' ও 'অন্যের মাধ্যমে বিপ্লব এগিয়ে নেয়া'র একটা ঝোঁক ছিল। ফলে পার্টি তার সীমিত শক্তিকেও পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল ৬ দফা ও **১১** দফাকে সামনে রেখে জনগণের আস্থা অর্জন করে।[৪]

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম দিকে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে দেখা যায় ২৬ মার্চ শুরু হওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণে কমিউনিস্ট পার্টি অপ্রস্তুত ছিল না।[৫] **২৫** মার্চ পাকিস্তান সরকার ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে। পার্টির নেতৃবৃন্দ, সভ্য ও কর্মীগণ **২৫** মার্চ পরবর্তীকালে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও মেঘালয়-এ তিনটি রাজ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ অবস্থান নেন। এসময় পার্টি সংগঠন

সাময়িকভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সহায়তায় বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।[৬] কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনগুলো ভারতে আগত তাদের নেতা-কর্মী-ক্যাডারদেরকে যৌথভাবে দেখাশোনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও মেঘালয় রাজ্যের সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম ও আগ্রহী বামপন্থি তরুণ কর্মীদের জন্য অনেকগুলো 'ইউথক্যাম্প' স্থাপন করা হয়। ৩/4 মাসের মধ্যে এসব ক্যাম্পে ২৫/৩০ হাজার তরুণ সমবেত হয়। তাদের জন্য সেখানে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রাথমিক ধরনের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলে। এখান থেকে সুযোগ মতো অনেকে মুক্তিবাহিনীতে চলে যায়।[৭] আবার পার্টি তার শক্তির একটি অংশকে দেশে রেখে যায়। শত্রু অধিকৃত এলাকার ভয়ঙ্কর বিপদজনক পরিস্থিতির মধ্যে থেকে ক্রমে তারা সারা দেশে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক স্থাপন করে। পরবর্তীকালে যখন প্রশিক্ষিত গেরিলা দলগুলো দেশে প্রবেশ করে তখন তাঁরাই সেই যোদ্ধাদের আশ্রয় ও অন্যান্য তৎপরতার সহায়তা প্রদানের একটি প্রধান অবলম্বন রূপে কাজ করতে সক্ষম হন।

এপ্রিলে বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করলে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সম্পাদকমন্ডলীর উপস্থিত সদস্যগণের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনকে স্বাগত জানিয়ে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে সরকারের সঙ্গে পার্টির পক্ষ হতে একটি প্রকাশ্য বিবৃতি দেয়া হয়। বিবৃতিতে পার্টি সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল এবং শান্তি ও স্বাধীনতাপ্রেমী জনগণকে এবং বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে এই সরকারকে সমর্থনদানের আবেদন জানায়। সেই সাথে বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, মহিলা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে 'আমাদের মাতৃভূমির' মুক্তির জন্য বীরের মতো সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানায়। পাশাপাশি ঐ বিবৃতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং পাখতুন জনগণের কাছেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করার আহ্বান জানানো হয়।[৮] স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু হতে পার্টি যে রাজনৈতিক নীতি গ্রহণ করে তা হলো, স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়ের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কর্মতৎপরতা গড়ে তোলা। এ লক্ষে পার্টি সব রাজনৈতিক দলের সমবায়ে 'জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট' গঠনের প্রচেষ্টা চালায়। অজয় রায় এর মতে, "মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি প্রবাসী সরকারের

নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সর্বদলীয় চরিত্র দেবার জন্য বক্তব্য উপস্থাপন করে আসছিল। প্রবাসী সরকারের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তার বিরোধীতা আসছিল আওয়ামী লীগের বেশ কিছু নেতাকর্মী। তাঁদের কথা ছিল আওয়ামী লীগ এককভাবেই নির্বাচনের জয়লাভ করেছে। কাজেই একমাত্র তাদেরই অধিকার আছে শুধু সরকার গঠন নয়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনেরও।"[৯]

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পার্টি (সিপিবি) বিশেষ ৩টি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে: ১. পার্টি কর্মী ও মেহনতী তরুণদের মুক্তি সংগ্রামে সংগঠিত করা। ২. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা। ৩. বিশ্বের কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সাহায্য ও সমর্থন আদায়। পার্টি সাধারণ মুক্তি বাহিনীতে তার সদস্য ও সমর্থকদের এবং সাধারণ তরুণ-যুবকদের অংশগ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সেই সাথে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের একটি যৌথ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনী পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নিয়োজিত হয়।[১০] এ পর্যায়ে পার্টির সংগঠিত হওয়ার কাজের ধারাগুলো ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ:[১১]

ক. কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ ক্যাম্প স্থাপন। দু'ধরনের ক্যাম্প ছিল- পার্টির বয়স্ক সদস্যদের পরিবারবর্গসহ আশ্রয়ের জন্য ও যুদ্ধে পাঠানোর জন্য তরুণদের 'ইয়থ ক্যাম্প'।

খ. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের সহায়তায় সীমান্তবর্তী ভারতের তিনটি রাজ্যেই অবস্থিত ক্যাম্পগুলোতে খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

গ. ক্রমশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ এবং পার্টির ক্যাম্পে সংগঠিত তরুণদের সরকারের মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং-এ প্রেরণ।

ঘ. পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের মিলিত একটি নিজস্ব গেরিলা বাহিনী গঠন। উক্ত বাহিনী গঠনে প্রথমে অসুবিধা হলেও পরে ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে তা গঠন করা হয়।

ঙ. আগরতলায় এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে কলকাতায় কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় গঠন করে কাজ করা।

চ. পার্টির নিজস্ব গেরিলা বাহিনীকে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেশের ভেতরে যুদ্ধ করতে পাঠানো।

ছ. দেশের ভেতরে কমরেডদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং অনুপ্রবিষ্ট গেরিলাদের সহায়তা প্রদান।

জ. পার্টির ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা তরুণদের রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ঝ. কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করে তা সকল ক্যাম্পে, শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ও দেশের অভ্যন্তরে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

২০ এপ্রিল ছাত্র ইউনিয়ন ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ছাত্র ও শ্রমিকদের প্রতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা প্রকাশ করে। জুলাইতে বাংলাদেশের যুব সম্প্রদায়ের নিকট কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানায় যে, 'হানাদার সৈন্যরা যখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিতেছে, আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করিতেছে তখন আপনারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আপনারা ইহার বদলা নিন, হাজার হাজারে বাঙলাদেশের সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করুন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম দ্বারা হানাদার সৈন্য নিশ্চিত করিয়া স্বাধীন ও নতুন বাঙলা গড়িয়া তুলুন।'[১২] আবার 'বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিজয় সুনিশ্চিত' এই শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ-তে প্রকাশ করা হয় যে, সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হলে তিনটি দিক স্পষ্ট করতে হবে। প্রথমত: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শত্রু-মিত্র চিহ্নিত হবে। এ লড়াইয়ে শত্রু সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন পুষ্ট পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী ও সামন্তবাদ, শ্রেণি এবং তাদের প্রতিভূ ইয়াহিয়া চক্র ও তাদের সামরিক বাহিনী। এর মিত্র বাংলাদেশের সকল শ্রেণির সমগ্র জনগণ (ইয়াহিয়ার চক্রের সহযোগী মুষ্টিমেয় বেইমান ছাড়া) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচ, পাঠান, সিন্ধি প্রভৃতি নিপীড়িত জাতির জনগণ এবং পাঞ্জাবের সামন্তবাদী একচেটিয়া পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত গণতন্ত্রকামী সাধারণ মানুষ।

দ্বিতীয়ত: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শত্রু মিত্রকে চিহ্নিত করতে হবে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তির একাংশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত: মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে মোহ রয়েছে। আজ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদীরা ইয়াহিয়া চক্রের সাথে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ। ইয়াহিয়া অস্ত্রদাতা। এরা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শত্রু। পক্ষান্তরে দুনিয়ার সকল গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ বাংলাদেশের বন্ধু। এশিয়া আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে বাংলাদেশের, সংগ্রাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি আছে সত্য কিন্তু তা অতিক্রম করে আফ্রো-এশিয় রাষ্ট্রবর্গের সমর্থন সংগ্রহ করতে হবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রবর্গ বিশেষতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব জার্মানি, চেকশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র খুনী ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ে দ্রুত ও সুনিশ্চিত বিজয় অর্জন এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সমর্থন লাভের জন্য সকল সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন অপরিহার্য। বাংলার মুক্তি সংগ্রামে সকল শ্রেণির সমস্ত সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন অপরিহার্য। বাংলার মুক্তি সংগ্রাম সকল শ্রেণির সমস্ত মানুষের সর্বাধিক সমাবেশের জন্য একান্ত জরুরী। ভিয়েতনাম, আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশের মুক্তিসংগ্রামে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। কাজেই আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো.) ও কমিউনিস্ট পার্টি সহ সকল সংগ্রামী দল সংগঠনকে সর্বনিম্ন কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা দরকার।[১৩]

১৯৭১ সালের **১২** মে মাসে প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মৌলিক চরিত্র, সে সংগ্রামের শক্তি এবং শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে 'মূল্যায়ন' করে একটি দলিল গৃহীত হয়। প্রবাসে ও দেশের অভ্যন্তরে পার্টির ভেতর তা প্রচারিত হয়। মূল্যায়নে বলা হয়, পাকিস্তানের শাসকবর্গের শাসন ও শোষণ ঔপনিবেশিক ধরনের। তাই বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। এ সংগ্রামে ক্ষুদ্র কতগুলো সাম্প্রদায়িক শক্তি ব্যতিত কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বাংলাদেশের আপামর জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে সমবেত হয়। স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে ওঠে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক যুবক এবং বাঙালি সৈন্য, ই.পি.আর ও পুলিশ মুক্তি বাহিনী ও সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদান করতে স্বঃপ্রণোদিত হয়ে অগ্রসর হয়। পাশাপাশি মূল্যায়নে বলা হয় যে, 'স্বাধীনতার জন্য জনগণের দৃঢ় একতা এবং মুক্তিবাহিনীর বীরত্ব ও ত্যাগ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শক্তি এবং প্রতিবেশী ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবির, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও দুনিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতিকামী শক্তি আমাদের বন্ধু এবং অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মাওবাদী চীন ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা পাকিস্তানের সমর্থক ও আমাদের স্বাধীনতার শত্রু।'[১৪] চলমান সংগ্রাম সম্পর্কে

পার্টির মূল্যায়নে কিছু দুর্বল দিকেরও উল্লেখ করা হয়।

কমিউনিস্ট পার্টি সকল দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের প্রতি জোড় দেয়। পার্টির মত ছিল এ সংগ্রামে দ্রুত ও সুনিশ্চিত বিজয়ের একটি অপরিহার্য শর্ত হলো আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ (মো.) সহ সকল সংগ্রামী শক্তির সমবায়ে সম্মিলিত জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠন করা। সেই সাথে বলা হয় বাংলাদেশের সংগ্রামী দল ও শক্তি যত দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে সমর্থনও তত তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়াকে তাদের বিশেষ ও কঠিন ঐতিহাসিক দায়িত্ব হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে পার্টির মৌল ভূমিকা হিসেবে উল্লেখ করা হয়:[১৫]

১. সশস্ত্র সংগ্রামে নিজ উদ্যোগে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ।
২. সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সামরিক, রাজনৈতিক, সাংগঠনিক ও অন্যান্য সকল দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করা।
৩. ঐক্য ফ্রন্ট গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়ে সর্বস্তরে প্রচেষ্টা চালানো।
৪. এ সংগ্রামে আশু লক্ষ্য অর্জনের সাথে সাথেই যেন এ সংগ্রাম জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে পারে, এরজন্য পার্টিকে সর্বদা সজাগ থাকা।

আগস্টে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলে যে, 'দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ জনগণের ঐক্য, সাহস ও সংগ্রামী মনোবল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বড় শক্তি। জনগণের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তি অপরাজেয়- এই দৃঢ় প্রত্যয় লইয়াই কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিতেছে।' সেই সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের দৃঢ় আস্থা নিয়ে সেই বিজয়কে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি দেশবাসীর কাছে কয়েকটি আবেদন রাখে:[১৬]

১. বাংলাদেশের প্রতিটি শহর-বন্দর-গ্রাম-গঞ্জ, প্রতিটি গৃহকে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দূর্গ হিসেবে গড়ে তুলুন।
২. জনগণের শক্তিকে সংগঠিত করুন। মনে রাখবেন, পূর্বে আমাদের আন্দোলন ছিল নিয়মতান্ত্রিক ধরনের এতে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান

ছিল অধিক। বর্তমান সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জয়লাভের সংঘবদ্ধরূপে গড়ে তুলতে হবে।

৩. ছাত্র-যুবক ও শ্রমিকদের পাশাপাশি কৃষক ভাইয়েরাও আরও বেশি সংখ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবী, কাজেই কৃষক সমাজ কত অধিক সংখ্যায় ও কতটা সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করেন তার উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে কত শীঘ্র স্বাধীনতার লড়াই সাফল্যজনক পরিসমাপ্তিতে পৌঁছাবে।

৪. বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীতে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে যোগ দিন। নানা অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে শত্রুর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নিন, আমাদের সকলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল মুক্ত করুন।

৫. বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া-চক্র ও তার অনুচরেরা হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি-অবাঙালি প্রভৃতির মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ উস্কে দিয়ে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন ও সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখুন।

৬. স্থানীয়ভাবে মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে গোপন মুক্তি সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। দুষ্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধীদের দমন করুন ও মুক্তিসংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে গ্রামরক্ষা বাহিনী গড়ে তুলুন। চোরাকারবার ও মুনাফাখোরী দমন করুন।

৭. শত্রুবাহিনীর সাথে সর্বপ্রকার অসহযোগিতা করুন এবং তাদের অবস্থান ও চলাচলের খবর মুক্তিবাহিনীর নিকট পৌঁছে দিন। মুক্তিবাহিনীর খবর গোপন রাখুন। মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয়, রসদ প্রভৃতি দিয়ে সহায়তা করুন। মনে রাখবেন, মুক্তিযোদ্ধারা আপনাদেরই সন্তান, দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল হতে মুক্ত করতে তারা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে লড়াই করছে।

সর্বশেষে বলা হয়, বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশের বীর জনগণের সংগ্রামকে চূর্ণ করে দিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নাই। শ্লোগানে বলা হয়, 'স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। আবার আগস্টের ৬ তারিখে পার্টি এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আশু মুক্তির দাবি করে তাঁর বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র

প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। বিবৃতিতে বলা হয়, অতুলনীয় গণহত্যা ও বর্বরতা চালিয়েও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে দমাতে না পেরে ইয়াহিয়া খান এখন বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছে। এই ঘটনায় পার্টি গভীরভাবে উদ্বীগ্ন ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শেখ মুজিবুর রহমানের আশুমুক্তি দাবি করে।[১৭]

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে চীনপন্থি কয়েকটি গ্রুপ যখন একত্রিত হওয়ার কৌশল অবলম্বন করে সে সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিও জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানায়। পার্টির মতে, স্পেন, আলজিরিয়া, ভিয়েতনামের মতো বাংলাদেশেও সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সকলের যুক্তফ্রন্ট গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকল শক্তির সমন্বয়ে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠিত হলে মুক্তি সৈনিকদের মধ্যে তা এক বিপুল অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করবে। এ প্রসঙ্গে মণি সিংহ বলেন, 'আমরা আওয়ামী লীগের চেয়ে ছোট পার্টি সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী পার্টির কর্মীরা জনস্বার্থে জীবন উৎসর্গ করে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সচেতনভাবে মৃত্যুবরণ করতে সদা প্রস্তুত। তাছাড়া একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিরই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।'[১৮] তবে একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে পার্টির কিছু শর্ত ছিল। পার্টির কর্মসূচির সাথে যারা ঐক্যমত পোষণ করবে তাদের সাথেই মুক্তিফ্রন্ট গঠনের কথা বলা হয়।

মুক্তিফ্রন্ট গঠনের আহ্বানের পাশাপাশি ২৮ জুন ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে, কেবলমাত্র সুসংবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আনতে হবে। এছাড়া পার্টির বিবৃতিতে বলা হয় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে নতুন করে অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে ইয়াহিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি জনগণের কাছে আবেদন করে যে, জনগণকে স্পষ্ট করেই উপলব্ধি করতে হবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শত্রু হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পার্টি জনগণকে ইয়াহিয়ার সাম্প্রতিক ঘোষণাকে সম্পূর্ণ বাতিল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানায়। সেই সাথে স্বায়ত্তশাসন এবং গণতন্ত্রের জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণকে ইয়াহিয়ার শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আবেদন জানায়। পাশাপাশি ইয়াহিয়া খানকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের খোলাখুলি অস্ত্র সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে পার্টি

ঐকান্তিকভাবে পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক শক্তিকে খোলাখুলি দ্ব্যর্থহীনভাবে বাংলাদেশের ৭ কোটি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করে।[১৯]

ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রসঙ্গে মোজাফ্ফর আহমদ একটি বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খান যে রক্তের স্রোত বাহাচ্ছে, বিশ্বের জনমতকে শুধু তার নিন্দা করলেই চলবে না, লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যার বীভৎসতা চালানোর জন্য যারা প্রকাশ্যে নির্লজ্জভাবে তাকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাচ্ছে তাদেরও নিন্দা করার আজ সময় এসেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইয়াহিয়া খানের কাছে জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ ইয়াহিয়া খান যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের হাতের পুতুল, সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভণ্ডামী উদঘাটিত হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের গণতন্ত্রের প্রতি এহেন বিশ্বাসঘাতকতা বাংলাদেশের মানুষ কখনো ভুলবে না। এর ফলে শুধু নিজস্ব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের মুক্তি অর্জনের জন্য সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই বাংলাদেশের জনগণের বৃদ্ধি পাবে এবং তারা কারো কাছ থেকে উপহার হিসেবে স্বাধীনতা আসবে বলে অপেক্ষা করবে না।[২০]

বিশেষ গেরিলা বাহিনী

১৯৭১ সালের মে মাসে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী' গঠন করে। ভারত সরকার তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র সরবরাহের পরিকল্পনা অনুমোদন করে। আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ নানা বিবেচনায় বামপন্থিদের 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী' গঠনের সুযোগ করে দিলেও, ভারত সরকার অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে এই কার্যক্রম পরিচালনা করে। ঠিক একই সময়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের নিয়ে গঠন করা হয় বিএলএফ (মুজিব বাহিনী)। উল্লেখ্য, ভারত সরকার সিআইএ ও এমআইসিক্স-এর আদলে একটি বাহিনী গঠন করে **১৯৬৮** সালে, যার নাম দেয়া হয় 'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং)। সংগঠনটির প্রথম প্রকল্পের নাম 'বাংলাদেশ'। 'র' এর তত্ত্বাবধানেই 'মুজিব বাহিনী' প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় এবং এ বাহিনী ছিল কট্টরভাবে বাম- বিরোধী।[২১] অস্ত্র চালানোর পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।[২২] যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনীর প্রধান তৎপরতা ছিল কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের বাধাদান। মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভ থেকেই আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে অবস্থান নিলেও মুজিব বাহিনী তাদেরও ছাড়

দেয়নি। এ সম্পর্কে মণি সিংহ বলেন, "আমরা আওয়ামী লীগসহ স্বাধীনতার পক্ষের সকল শক্তির বৃহত্তম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলাম। এই প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। ... আমরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজস্ব শক্তির ওপর জোর দিতাম। এই সকল বিষয়ে আওয়ামী লীগের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আওয়ামী লীগের একাংশের তরুণদের দ্বারা 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি পৃথক বাহিনী গঠিত হওয়ার পর তাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে আমাদের সমর্থক গেরিলাদের দেশের ভেতরে প্রেরণের প্রশ্নে সরকারের সঙ্গে আমাদের অসুবিধা দেখা দিল।"[২৩]

কমিউনিস্টদের প্রতি বাধা ও আক্রমণের সাধারণ কারণ ছিল ভারতীয় কমান্ডের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের যে কোনো ধরনের কমিউনিস্ট ধারার বিকাশকে বাধা প্রদানের নীতি। তাই দেশের অভ্যন্তরে যেখানেই কমিউনিস্টরা নিজস্ব স্বাধীন শক্তিতে যুদ্ধাঞ্চল ও মুক্তাঞ্চলের বিকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছে সেখানেই বাধা ও আক্রমণ এসেছে।[২৪] মুজিব বাহিনীর সদস্যদের কেউ কেউ বলেন, তারা যেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সেখানে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পাশাপাশি কমিউনিস্টদের মোকাবেলা করার কথা বলা হয়। মোটিভেশন ক্লাসে তাদের বলা হতো, "একজন রাজকারকে যদি তোমরা ধর- তাকে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। প্রয়োজনে তথ্য পেতে কিছু শারীরিক নির্যাতনও করতে পারো। তথ্য সংগ্রহ শেষে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। আর যদি কোনো কমিউনিস্টকে ধরো সঙ্গে সঙ্গে প্রাণসংহার করবে।'[২৫] কমিউনিস্টদের দমন করতে মুজিব বাহিনী শুধু রাজনৈতিক শিক্ষাই গ্রহণ করেননি, তারা কমিউনিস্ট কর্মীদের আটক ও নির্মূল করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকেও সহায়তা করতেন। এ প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠনে সক্ষম হয়। একটি বিশেষ রাজনৈতিক কমান্ডো বাহিনী হিসেবে মুজিব বাহিনী গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বাধীন মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নিজেদের জন্য একটি পৃথক গেরিলা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) সহায়তায় মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি পৃথক 'যুব অভ্যর্থনা শিবির' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০ এর অধিক গেরিলা যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে, যারা পরবর্তী সময়ে ঢাকা ও কুমিল্লা অঞ্চলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।[২৬] কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের সংগঠিত করার বিষয়ে মুজিব বাহিনীর ঘোর আপত্তি ছিল। তাদের ট্রেনিং গ্রহণ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বাধার সৃষ্টির পর সংকট নিরসনের জন্য ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি নুরুল ইসলাম তাজউদ্দীন আহমদ ও কর্নেল

ওসমানীর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। এক পর্যায়ে ডি.পি ধরের সাথেও ছাত্র ইউনিয়নের বৈঠক হয়। এ বৈঠকের মধ্য দিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মুজিববাহিনীর সাথে 'সেমসাইড' দুর্ঘটনার আশঙ্কা দূরীভূত হয়। তাই দেখা যায়, তাজউদ্দীন আহমদের আগ্রহের কারণে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ও তার রাজনৈতিক মিত্র ন্যাপ (মোজাফ্ফর) এবং কমিউনিস্ট পার্টি শেষ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং এর সুযোগ লাভে সমর্থ হয়। তবে এর ফলে তাজউদ্দীন আহমদ অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হন।[২৭]

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দিকে গড়ে ওঠা স্বল্প প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তরুণ কর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পরে সেক্টর কমান্ডারদের অধীনে এফএফ বাহিনী গড়ে তোলা হলে উক্ত বাহিনীতে বামপন্থিদের যোগদানে নানা বাঁধা প্রদান করা হয়। তা সত্ত্বেও নানা কায়দায় বাঁধা অতিক্রম করে বামপন্থি তরুণরা এফএফ বাহিনীতে যোগ দিয়ে লড়াই করেন। ঢাকার দুর্ধর্ষ ক্র্যাক প্লাটুনের দুঃসাহসী অভিযানগুলোসহ দেশের বিভিন্ন অংশে তাঁরা লড়াই-এ অংশ নেন। মে মাসে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের সহযোগিতায় তরুণ মুক্তিযোদ্ধার গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনী গঠন, ব্যবস্থাপনা ও ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, চৌধুরী হারুন অর রশিদ ও মোহাম্মদ ফরহাদ।[২৮] বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন ছাড়াও পার্টি ও ভ্রাতৃপ্রতীম দলগুলোর যৌথ উদ্যোগে প্রায় ১৭ হাজার তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে ট্রেনিং ও যুদ্ধের জন্য সংগঠিত করা হয়। পার্টির গেরিলা টিম বাংলাদেশের সকল জেলায় পাঠানো হয়। ঢাকা, নরসিংদী, রায়পুরা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুরসহ উত্তরবঙ্গের কয়েক স্থানে টিমগুলো গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করে। আর যারা ভারতে যাননি তারা দেশের ভেতরে যুদ্ধের জন্য সংগঠিত হন এবং তারাই ভারত থেকে আসা গেরিলাদের আক্রমণে সাহায্য করেন।[২৯] সামরিক ট্রেনিংয়ের পূর্বে প্রত্যেক ক্যাম্পে (কর্মী-শিবির) কমবেশি রাজনৈতিক আলোচনা ও রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ সংগঠিত ক্যাম্প জীবন, সামরিক শিক্ষা, রাজনৈতিক শিক্ষা ও গেরিলা বাহিনী গঠন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার্টি সভ্য, কর্মী ও সমর্থকদের একটি সংগঠিত রাজনৈতিক জীবন ও সংগ্রামী মনোবল গড়ে ওঠে। এভাবে বহু নতুন কর্মী পার্টির সংস্পর্শে আসে এবং কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনা ও পার্টির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। তবে এসময় ক্যাম্প পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাপ্রকার সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি পার্টির মধ্যে জেলাগত মনোভাবও কিছু কিছু পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের

শুরুতে পার্টির কমরেডরা এত বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে যে, নেতৃত্বের পক্ষে সংগঠনকে গুছিয়ে আনা ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ও সেক্টরের পক্ষে একস্থানে থেকে কাজ করাও সম্ভব হয় না। হেড কোয়ার্টার সমস্যা, কেন্দ্রীয় কমিটি ও সেক্টরফাংশন করার সমস্যাও দেখা দেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু নতুন নতুন কর্মী পার্টির সদস্যপদ লাভের উপর্যুক্ত হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর পার্টি সদস্যপদ লাভ করে।[৩০]

বিশেষ গেরিলা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষে আসামের তেজপুতের নিকটবর্তী সালোনবাড়ি নামক স্থানে একটি বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। সেখানে মে মাসের ২৮ তারিখে কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন-ন্যাপ এর 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী'র প্রথম ব্যাচের ২০০ জনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্য হতে ৫০ জনকে বিশেষ ট্রেনিং-এর জন্য নেফা এলাকার ভালুকপং-এর নিকটস্থ একটি দুর্গম ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ট্রেনিং-এর পুরো কার্যক্রমই ছিল দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের কায়দা-কৌশল সম্পর্কে। এ গ্রুপের ট্রেনিং শেষ হয় ১১ জুলাই। এরপর পরবর্তী ব্যাচের ট্রেনিং-এ ৪০০ জনকে নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যাচেরও প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ শেষে 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী' ত্রিপুরার বাইকোরার একটি নির্জন স্থানে 'বেইজ ক্যাম্প' স্থাপন করে। এখান থেকে ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়নের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ও তাঁদের দ্বারা গঠিত 'অপারেশন প্ল্যানিং কমিটি'র পরিচালনায় দেশের ভিতর গেরিলাদের 'ইনডাকশনে'র কার্যক্রম ও গেরিলা অপারেশনসহ সামরিক তৎপরতা চালানো হয়। যার যেখানে গেরিলা তৎপরতা চালানো সুবিধা, সেইমতো করে ছোট ছোট দলে গেরিলাদের ভাগ করে দেশের ভেতর প্রেরণ করা হয়। দেশের অভ্যন্তরের নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছার পর তাদেরকে প্রথমে গেরিলা কায়দায় জনগণের মাঝে জায়গা করে নিতে এরপর খবরাখবর নিয়ে পরিকল্পিতভাবে অপারেশন চালাতে বলা হয়।

'বিশেষ গেরিলা বাহিনী' পরিচালিত হতো ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ নেতৃত্বে। সামরিক বিষয়ে পরিচালনা ও কমান্ডের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হয় ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'অপারেশন প্ল্যান্টিং কমিটি'র উপর। পূর্বাঞ্চলীয় জোন ও পশ্চিমাঞ্চলীয় জোন-এ দুই কেন্দ্র ধরে সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গেরিলা বাহিনীর প্রথম ব্যাচ সেপ্টেম্বরের শুরুতে ইনডাকশন শুরু করে। কষ্টসাধ্য ক্যামোফ্লোজ সহযোগে প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ

ইত্যাদিসহ ছোট ছোট গেরিলা গ্রুপ একে একে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিক থেকে ছোট ছোট অপারেশন শুরু হয়। এক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলীয় জোনের কাজ আগে ভাগে শুরু করা গেলেও পশ্চিমাঞ্চলীয় জোনের কেন্দ্র স্থাপনে কিছুটা বিলম্ব হয়। সেপ্টেম্বরে গেরিলা বাহিনী নিজস্ব কায়দায় ধীরে ধীরে আক্রমণ চালালেও অবস্থা বুঝে নভেম্বরের দিকে অ্যাকশনের সংখ্যা বাড়ায়। যখন বোঝা যায় সহসাই চূড়ান্ত পর্যায়ের কনভেনশনাল যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, তখন সব গেরিলা ইউনিটকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, পাকিস্তানি সেনারা যেন ক্যাম্পের বাইরে মুভমেন্ট করতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হতে। সেই সাথে গেরিলা কায়দা অনুসরণের বদলে যুদ্ধের কনভেনশনাল কলাকৌশল অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝিতে অবস্থার গতিবিধি দেখে অপারেশনের মাত্রা জোরদার করা হয়। ফলে রায়পুরা, মনোহরদী, শিবপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বৃহত্তর বরিশাল প্রভৃতি এলাকায় একের পর এক নানা ধরনের সফল এ্যাকশন পরিচালনা করা হয়। এরপর সর্বাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে সব ইউনিটকে যত দ্রুত সম্ভব ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছে ঢাকাকে ঘেরাও-এর মধ্যে চেপে রাখতে বলা হয়। এমনকি ট্রেনিংপ্রাপ্ত যে কয়েকশ গেরিলা তখনো 'ইনডাকশন' হয়নি তাদের সবাইকে এক সাথে নিয়ে অনেকটা ফোর্সড-মার্চের কায়দায় অতি দ্রুত ঢাকার দক্ষিণাঞ্চলে এসে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। ১৩ ডিসেম্বরের মধ্যে 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী'র যোদ্ধারা দোহার, নবাবগঞ্জ, শ্রীনগর, গজারিয়া ইত্যাদি এলাকায় জমায়েত হয়ে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। ১৪ ডিসেম্বর অস্ত্রসজ্জিত ও সমর-সম্ভারসহ গেরিলা দলের ঢাকায় প্রবেশের অভিযান আরম্ভ হয়। আর গেরিলা ইউনিটগুলো ঢাকার কেন্দ্রে পৌঁছার আগেই ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী আত্মসমর্পন করে।[৩১] মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১ নভেম্বর কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার বেতিয়ারা গ্রামে বিশেষ গেরিলা বাহিনীর সাথে পাকিস্তান বাহিনীর সম্মুখ সংঘর্ষ হয়। সেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

কমিউনিস্ট পার্টি ভারত সরকারের সহায়তায় বিশেষ গেরিলা বাহিনী গঠন করলেও তাদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা ইতিবাচক ছিল না। শুরুতে কমিউনিস্ট গেরিলাদের কোনোপ্রকার অস্ত্রই সরবরাহ করা হতো না। কিছু সময় তাদের অস্ত্র সরবরাহ করা হয়। আবার বামপন্থিদের ব্যাপারে প্রবাসী সরকারের উৎকণ্ঠা ছিল। বামপন্থিদের অভিযোগ ছিল বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ক্ষেত্রে বামপন্থি বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়নের

কর্মীদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে না। বিএলএফের নেতারাও সতর্ক ছিলেন, যাতে বামপন্থিরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র না পায়। এ প্রসঙ্গে জেনারেল উবানের কাছে বিএলএফ-এর নেতাদের কট্টর বাম বিরোধীতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের কথোপকথন থেকে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিএলএফ-এর যুবনেতাগণ জেনারেল উবানকে প্রশ্ন করেন 'স্যার আমরা আশা করিনি আপনারা নকশালপন্থি ও মার্কসবাদীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপাতি দেবেন, যাতে আমরা গত ২৫ বছরের যা অর্জন করেছি তা বরবাদ হয়ে যায়।'[৩২] ৩ জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মস্কোপন্থি) কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ভবানী সেন-এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়। তিনি বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের ভারতের সরকারি কর্মচারীরা শিক্ষাদানের প্রশ্নে যে মনোভাব অবলম্বন করেছে তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানান। পাশাপাশি তিনি বলেন, যদিও কমিউনিস্ট এবং ন্যাপের যুবকর্মীরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত যোদ্ধা তবুও শিক্ষা শিবিরগুলোতে এদের সঙ্গেই বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া তিনি জানান বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও এখনও আওয়ামী লীগের উঁচু মহলে এ প্রশ্নে কিছু বাঁধা আছে।[৩৩]

বহির্বিশ্বের প্রতি আহ্বান

মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিশ্বজনমত গঠনে। পাকিস্তান সরকার যেখানে প্রচার করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের এরূপ ব্যখ্যার পক্ষে অবস্থান নেয়। এমতাবস্থায় বহিঃবির্শ্বের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে এর পক্ষে বিশ্বজনমত বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সমর্থন আদায়ে পার্টি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে।[৩৪] কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধ পরিচালনার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন ও সাহায্য সমবেত করার কাজে উদ্যোগ নেয়। এর ফলে ১৯৭১ সালের মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিসহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। উক্ত চিঠি হতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। জাতিসংঘে, বিশ্ব শান্তি পরিষদে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে,

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিধি দল ও বার্তা প্রেরণ করে। এসব মহলে পার্টি মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরে। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটছে, তা সাম্রাজ্যবাদ অথবা স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। এটা বস্তুত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারায় বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।'[৩৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় দক্ষিণ এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী রণনীতি পরাজয় স্বরূপ এবং শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তির জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়।[৩৬]

মস্কোপন্থি পার্টির তত্ত্বানুসারে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ও শ্রেণি সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানায় এবং বিশ্বের সকল কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনের আহ্বান জানায়। পার্টির মতে, 'নির্যাতিত জনগণের মুক্তি সংগ্রামের ভিত্তিমূল সংগ্রামের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন। কাজেই আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক জনগণের সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতাই বাঙলাদেশের সংগ্রামের বিজয়ের একমাত্র শর্ত।'[৩৭] বাংলাদেশ শান্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক আলী আকসাদ বলেন, 'ভারত-পাক উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা হিংস্র ও বহুমুখী আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আজ পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী সাম্প্রদায়িক সামরিক চক্র বাংলাদেশে সংঘটিত করছে। এর ফলে সমগ্র এশিয়ার শান্তি, স্বাধীনতা ও স্থায়িত্ব গুরুতরভাবে বিপন্ন হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের সমস্যাকে আর পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা রূপে গণ্য করা যায় না। এটা একটা আন্তর্জাতিক বিষয় এবং সমস্যার সমাধান কেবল সেই স্তরেই সম্ভব।'[৩৮]

পাশাপাশি শান্তি আন্দোলন ও অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়। আর এ লক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি এপ্রিল মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সহায়তায় তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বিদেশে পাঠায়। এই দলের সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগের আব্দুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের দেওয়ান মাহবুব আলী এবং কমিউনিস্ট পার্টির ডাঃ সারোয়ার আলী। উক্ত প্রতিনিধি দল ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী সফর করে প্রগতিশীল শক্তিসমূহের কাছে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া বাহিনীর ভয়াবহ গণহত্যা এবং এদেশের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয় তুলে ধরেন। এটাই ছিল বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম

প্রতিনিধি দল।[৩৯] সেপ্টেম্বরে কোচিনে অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়। সেখানে উপস্থিত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রতিনিধি বর্গের কাছে ও ২২টি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিগণের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য তুলে ধরা হয়। ফলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য দেশপ্রেমিক শক্তির সাহায্যে কমিউনিস্ট পার্টি সম্ভাব্য কাজে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়। ফলস্বরুপ ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আর এ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এফএফ বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর ইনডাকশন ও সশস্ত্র অ্যাকশন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীণ সম্পাদক আবদুস সালামকে বাংলার মুক্তিসংগ্রামে সহায়তাকরণের লক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠানো হয়।[৪০]

মোজাফ্‌ফর আহমদ ২৩ সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কোনো রাজনৈতিক মীমাংসা বাংলাদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। রাজনৈতিক মীমাংসা বলতে আমরা বুঝি, আর রক্তপাত না ঘটিয়ে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান। আমরা বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে বলতে চাই বাংলাদেশ হলো এক গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। নবজাত বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য বৈষয়িক সাহায্য, নৈতিক সমর্থন ও স্বীকৃতির জন্য আমরা জাতিসংঘে যাচ্ছি।[৪১] মোজাফ্‌ফর আহমদকে প্রধান করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়।

বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা কমিটি (সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের কূটনৈতিক ও সামরিক অবস্থান, আমেরিকা সফরের বৈরী নীতি, পশ্চিম ইউরোপে সরকারিভাবে ভারত কর্তৃক সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধাচরণ- এগুলো সামনে রেখে ভারতের পক্ষে এককভাবে কোনো বৃহৎ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিল না। ভারত মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছিল একটি শক্তিশালী পরাশক্তির যে শক্তি মার্কিন-চীন শক্তির মোকাবেলা করতে পারবে এবং যার প্রভাবে পূর্ব ইউরোপ প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃত ও সাহায্য দিতে পারে। আর সেই পরাশক্তি হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদিকে আওয়ামী লীগের একটা কমিউনিস্ট বিরোধী, পুঁজিবাদী ঘেঁষা ভাবমূর্তি ছিল। তাই লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারকে স্বীকৃতি এবং তার

সাহায্যার্থে সরাসরি এগিয়ে আসতে সোভিয়েত ব্লক বড় একট দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন ছিল বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ার। তা কেবল সম্ভব ছিল বড় ও প্রভাবশালী বামপন্থি দল এবং বৃহত্তম হিন্দু দলের সমর্থনে। আবার জাতীয় দুর্যোগ ও সংকটকালে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এই পরিষদ গঠনে নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪২] ৬ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভা বৈঠকে সর্বদলীয় ঐক্য স্থাপনের বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হয়। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নিজ হাতে লিখে প্রত্যেক নেতাকে আমন্ত্রণপত্র পাঠান[৪৩] এবং তদানুসারে **১৯৭১** সালে ৮ সেপ্টেম্বর পাঁচটি দলের সমন্বয়ে মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হয়। সদস্যরা হলেন, তাজউদ্দিন আহমদ, মোজাফ্ফর আহমদ, মওলানা ভাসানী, মনোরঞ্জন ধর, (কংগ্রেস) ও মণি সিংহ সহ আওয়ামী লীগের আরও দু'জন সদস্য। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঐ দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দু'দফায় বৈঠক করেন। সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সর্বসম্মতভাবে সাতটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪৪]

সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সমর্থক সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করে যে, 'সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হওয়ার জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জাতির নিবিড় ও অটুট ঐক্য আরেকবার প্রমাণিত হল, তাতে বাংলাদেশের ভিতরে উক্ত সংগ্রামীরা যেমন অনুপ্রাণিত হবেন, তেমনি বাইরে বাংলাদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু দেশগুলোও উৎসাহিত হবেন। বস্তুত এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের গুরুত্ব এইখানেই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনৈক্য সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং উগ্র তত্ত্বসর্বস্বদের সুবিধানীতি ভেদনীতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল।'[৪৫]

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মতে, এ কমিটি গঠনের ফলে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম নিয়োজিত সকল সংগ্রামী দল ও শক্তির সমান অংশীদারিত্বের মনোভাব নিশ্চিত হবে এবং বিভিন্ন দল ও শক্তির কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের মাধ্যমে মুক্তিসংগ্রাম আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি, সংযুক্ত কমিটি হলো জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে বাংলাদেশের সমগ্র জনগণের জঙ্গী একতার প্রতীক।[৪৬] উক্ত কমিটির তাৎপর্য সম্পর্কে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস রিপোর্টে বলা হয় যে, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তি যে একতাবদ্ধ, উহা ঐ কমিটি গঠনের মধ্য

দিয়া প্রত্যক্ষভাবে দুনিয়ার সামনে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ঐ কমিটি গঠনে দেশের অভ্যন্তরে জনগণের মনে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ছাড়া ঐ কমিটি গঠনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শক্তিগুলির ভিতর আরও সমঝোতা ও একতা গড়িয়া উঠার ভিত্তিও সৃষ্টি হইয়াছিল।'[৪৭]

৬-৭ নভেম্বর মুজিব নগরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় ঐক্যবদ্ধভাবে চরম আঘাত হেনে পাকিস্তান বাহিনীর ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করতে সমগ্র জনগণ ও সকল মুক্তি সংগ্রামীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এবং অংশগ্রহণ করেন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহ, আওয়ামী লীগের জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ ও শ্রী ফণী ভূষণ মজুমদার, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ ও কংগ্রেস নেতা শ্রী মনোরঞ্জন ধর। এছাড়া মন্ত্রীসভার সদস্যরাও সভায় যোগদান করেন। সভায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং মুক্তি সংগ্রামের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৪৮] এইচ.টি ইমাম-এর ভাষ্যমতে সর্বদলীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মনোভাব ও প্রত্যয় ফুটে ওঠে। কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সার্বিক জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা সুদৃঢ় হয়। সর্বদলীয় পরামর্শক পরিষদ গঠন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে এর অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ও স্বাধীনতাযুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। কারণ, এই পরিষদ গঠিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সরকারের কার্যক্রম সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক দৃষ্টি বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের প্রতি এক বিশেষ মাত্রায় নিবদ্ধ হয়। যুদ্ধরত বাঙালি জাতিকে সাহায্য-সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়। সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সমর্থন লাভের দ্বিধার ভাব এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। এসব দেশ মুক্তিযুদ্ধকালে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আর দেরি করেনি। উল্লেখ্য, সর্বপ্রথম ভুটান স্বীকৃতি দেয়। এরপরই স্বীকৃতি দান করতে শুরু করে ভারত, নেপাল, ইরাক, কিউবা, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ।[৪৯]

সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের যথাযথ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হলেও পরিষদ

বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দেয়ার মধ্যে কার্যক্রম সীমিত রাখে। কারণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে ও বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীসভায় সদস্যদের মধ্যে কমিটি গঠন সম্পর্কে বিরোধ ছিল। বিরোধের কারণ ছিল বিভিন্ন: প্রথমত, আওয়ামী লীগের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে পরিষদের বাকী ৪টি দল মন্ত্রীসভায় অংশ নিতে ইচ্ছুক; দ্বিতীয়ত, ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত ডি.পি ধর সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সকলকে একত্র করতে সমর্থ হওয়ায় অনেকে এটাকে ভারত সরকারের চাপ ও হস্তক্ষেপ বলে ধরে নেন। আর তাই এ পরিষদ গঠনের জন্য বিরোধী মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী করেন এবং ৪০ জন তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদক উভয় পদ থেকে তাজউদ্দীন আহমদের অপসারণ দাবি করেন। তাঁদের এ চেষ্টা এসময় ফলপ্রসু না হলেও দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর বহুমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৫০]

প্রচারণা

যুদ্ধের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি 'একতা' ও 'মুক্তিযুদ্ধ' নামে সাপ্তাহিক প্রকাশনা প্রকাশ করে। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সাপ্তাহিক 'একতা' প্রকাশ করা হয়। পার্টি তখন বেআইনী থাকায় প্রকাশ্যে 'একতা' প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। ২৫ মার্চ সাপ্তাহিক একতার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এরপর ভারতে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তমতে প্রকাশ করা হয় সাপ্তাহিক 'মুক্তিযুদ্ধ'। 'মুক্তিযুদ্ধে'র মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নে পার্টির বক্তব্য কমরেড ও সমস্ত দেশপ্রেমিকদের সামনে তুলে ধরা হতো। এটি পার্টির কমরেডদের ও অন্যান্য কর্মীর রাজনৈতিক শিক্ষার কাজে সাহায্য করে।[৫১] পাশাপাশি দেশের মুক্তাঞ্চলগুলোতে জনগণের মাঝে কীভাবে কাজ করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টি তার নির্দেশনাসহ 'ইশতেহার' দেশব্যাপি ছড়িয়ে দেয়।

খ. হাতিয়ার গ্রুপ

মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বের হয়ে আসা 'হাতিয়ার গ্রুপ' ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত দলের কর্মী সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক রিপোর্ট, বর্তমান পরিস্থিতি ও তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করে।[৫২] তাতে পার্টি তার ঐতিহাসিক কর্তব্য হিসেবে যে বিষয়গুলো তুলে ধরে তা হলো: ক. দেশের অভ্যন্তরে থেকে সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেরিলাযুদ্ধের নীতি, পদ্ধতি ও

কৌশল অবলম্বন করে দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ায় সশস্ত্র গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে হবে; খ. সশস্ত্র বৈপ্লবিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই শ্রমিক শ্রেণির পার্টির উদ্যোগে সমস্ত সাচ্চা বামপন্থি ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে; গ. এই যুদ্ধকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে হলে বামপন্থি শক্তিগুলোকে সুসংহত করতে হবে এবং ডান ও বাম এ দুটো সর্বনাশা ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে এ দুই অংশের দেউলিয়া নেতৃত্বের মোহ থেকে সমস্ত সৎ, একনিষ্ঠ ও সাচ্চা কর্মীকে সঠিকপথে পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে; ঘ. জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সুনিশ্চিত বিজয়ের জন্যে বামপন্থি গ্রুপগুলোর মধ্যে থেকে সাচ্চা কমিউনিস্টদের অতি অবশ্যই একটিমাত্র উপর্যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করে বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯৭১ সালের জুনে পার্টি তার ঐতিহাসিক কর্তব্যবোধ থেকেই জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট গড়ে তোলার লক্ষে আরও ৮টি গণসংগঠন, রাজনৈতিক দল ও গ্রুপগুলোর সঙ্গে একত্রিত হয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার শপথ গ্রহণ করে।[৫৩] গ্রুপটি মুন্সিগঞ্জ ও ঢাকায় কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ঢাকা-বরিশালগামী লঞ্চের ওপর তারা আক্রমণ চালান। গোপালগঞ্জের কালকিনি থানায় তাদের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য। এ গ্রুপের নেতা ছিলেন নাসিম আলী। তিনি ছাড়া এ গ্রুপে যারা সামরিক আক্রমণে নেতৃত্ব দেন তারা হলেন, আব্দুল খায়ের, রুহুল আমীন, নুরুল আনোয়ার, গিয়াস উদ্দিন প্রমুখ।[৫৪]

২. চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভক্তির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভাজন দেখা দিলেও চীন কোনো দিন কোনো পার্টিকে সমর্থন বা সহায়তা প্রদান করেনি। এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন, ঢাকায় চীনের দূতাবাস ছিল। সেখানে শুধু চীনা সরকার নয়, পার্টির লোকজনও ছিলেন। বাংলাদেশের চীনপন্থি নামে পরিচিত কোনো পার্টি বা গ্রুপের সাথে চীন কোনো ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করত না। প্রকৃতপক্ষে চীনা পার্টি আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলে অনেক প্রচারণা চালালেও কোনো দেশের বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার দৃষ্টান্ত নেই।[৫৫] বস্তুত এদেশের চীনপন্থিরা এতভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন যে চীন কোন পক্ষকে সমর্থন দেবে তা নিয়েও সংকট ছিল। অবশ্য নকশালবাড়ী কৃষক আন্দোলন

সম্পর্কে পিকিং রিভিউতে যে বক্তব্য প্রচার করা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে চারু মজুমদারকে চীন সমর্থক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ চীন চারু মজুমদারকে সমর্থন দান করেছে। আর বাংলাদেশের চীনপন্থি কমিউনিস্টগণ চারু মজুমদারকে সমর্থন করেন। এদেশের চীনপন্থি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ও মুক্তিযুদ্ধ পর্বে এর বিকাশ এ ধারাতেই প্রবাহিত হয়। অবশ্য চীনপন্থিদের একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজেদের আন্তর্জাতিক কোনো শিবিরের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বদলে মধ্যপন্থি হিসেবে প্রকাশ করেন। এ অংশটি ভারতে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। তবে মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্টদের অংশগ্রহণ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার উভয় দিক থেকেই অত্যন্ত সংশয়ের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়। মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও অস্ত্র প্রদানের দিক থেকে ভারত সরকারের আলাদা পর্যবেক্ষণ ছিল। তবে চীনপন্থিদের বেলায় সংশয় সর্বদা বিরাজমান ছিল। যার প্রভাব কার্যক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

সমসাময়িক নেতৃবৃন্দ বলেন মুজিব বাহিনী ভারত সরকার গঠন করেছিল বামপন্থিদের ঠেকাতে। ভারতে এসময় যে নকশাল আন্দোলন চলছিল তার প্রভাব এত বেশি ছিল যে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের একাংশ এ ধারাকে কঠোরভাবে গ্রহণ করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যদি বামপন্থি হয়ে যায়, নকশাল আন্দোলনের প্রতি যদি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, তবে ভারত সরকার মুজিব বাহিনীকে নকশালের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করবে। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও যদি বামপন্থিদের হাতে চলে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়, তাহলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে।[৫৬] যে কারণে ভারত সরকার এ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ সরকারের হাতে অর্পণ না করে নিজ হাতে রেখেছিল। যুদ্ধকালে মুজিব বাহিনী বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত এমন ব্যক্তিদের হত্যা করে, এমনকি বাম রাজনীতি করেন এমন সন্দেহের বশবর্তী হয়েও অনেককে হত্যা করা হয়। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনপন্থি কমিউনিস্টগণের ভূমিকা প্রভাবিত হয়েছে তাদের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বিরাজমান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'তৎকালীন বামপন্থী ও কমিউনিস্ট দলগুলি বিদ্যমান পরিস্থিতির গতি প্রকৃতি ও চরিত্র সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট পাকিস্তানী সরকারের জাতিগত নিপীড়ণকে শ্রেণী শোষণ ও নির্যাতনের একটি নির্দিষ্ট রূপ হিসাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের কাজকর্ম শুধুমাত্র

শ্রমিক কৃষকের কিছু অর্থনৈতিক সংগ্রাম এবং বুর্জোয়াদের কিছু কিছু সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।'[৫৭] নিম্নে মুক্তিযুদ্ধকালে চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অবস্থান তুলে ধরা হলো:

ক. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল)

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)'র সাথে চীনপন্থি চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন পার্টির সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পার্টির কমরেডগণ যেহেতু মনে করতেন চারু মজুমদারকে চীন স্বীকৃতি দিয়েছে সেহেতু ভারতের পার্টির বক্তব্য তাঁরা মেনে চলতেন। পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য খুলনার নজরুল ইসলাম একাধিকবার কলকাতায় গিয়ে চারু মজুমদারের সাথে দেখা করেন। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে চারু মজুমদার গণ সংগঠন বাতিল করে সরাসরি পার্টির সাথে জনগণের সম্পর্ক স্থাপনের নীতি নির্ধারণ করলে পূর্ব পাকিস্তান পার্টিকে গণ সংগঠন ত্যাগ করতে চারু মজুমদার শুধু পরামর্শ দেননি, দিয়েছেন চাপও। আর পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) এমন একটা সময় তা করেছিল যখন কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রসহ জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে সম্পৃক্ত করতে গণসংঠনের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য।[৫৮] এমতাবস্থায় ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে পার্টির সম্পাদকমন্ডলী ৪ এপ্রিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেন যে, বর্তমানে দেশ গৃহযুদ্ধের স্তরে নেই। এটি জাতীয় প্রতিরোধ যুদ্ধের স্তর। সামরিক শাসকদের কবল থেকে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে তাই যুদ্ধ চালাতে হবে। যে মুক্তিযুদ্ধ চলছে সে মুক্তিযুদ্ধের বর্তমান নেতা মার্কিন ও ভারতের উপর নির্ভরশীল আওয়ামী লীগ। পূর্ব বাংলা আর আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না। পূর্ব বাংলা বস্তুতঃ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জনগণের অন্তরে পাকিস্তান নেই, কোনোদিন তা আর স্থান নেবে না। যত দমননীতিই চলুক জনগণের মনে স্বাধীন বাংলার যে ছবি রয়েছে তা চির জাগরূক থাকবে। তাই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ যে পথ অনুসরণ করছে সে পথে পূর্ব বাংলার মুক্তি অর্জিত হবে না।[৫৯] অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। অন্য একটি সূত্র মতে কেন্দ্রীয় কমিটির সুখেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহার লাইন ছিল ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লড়াই চালানোর এবং আবদুল হক ও অজয় ভট্টাচার্য ছিলেন দুই কুকুরের যুদ্ধের তত্ত্বের পক্ষে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির ৭ জন সদস্যের মধ্যে একজন অনুপস্থিত থাকায় ৩-৩ ভোটে কোনো সিদ্ধান্ত

হয়নি। ফলে যুদ্ধের সময় এক একটি জেলা একেক লাইন প্রয়োগ করে।[৬০]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পার্টি'র একাংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে প্রত্যয় ব্যক্ত করে। বলা হয়, বর্তমান অবস্থায় পার্টির আওয়াজ হবে- 'সামরিক শাসকদের উচ্ছেদ কর; সামরিক শাসকদের সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন কর; নিশ্চিহ্ন কর তাদের সহযোগীদের। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ভারতের সম্প্রসারণবাদীরা যদি কোনো হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ করে তাকে প্রতিরোধ কর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ সকল সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের উচ্ছেদ কর। গ্রাম বাংলাকে মূল কেন্দ্র করে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকের উপর নির্ভর করে সশস্ত্র গণবাহিনী গঠন কর। হাতের কাছে যে অস্ত্র আছে তা নিয়ে সশস্ত্র হও, বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি সংগ্রহ কর; বোমা তৈরি কর, সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জনগণকে জাগিয়ে তোলো, গ্রামে গ্রামে পার্টির নেতৃত্বে গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের উপর নির্ভর করে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল দেশপ্রেমিকদের নিয়ে বিপ্লবী কমিটি গঠন কর। বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্বে গ্রামের পর গ্রামকে মুক্ত কর, সেখানকার সামরিক শাসকদের শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস কর, সেখানকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উৎপাদন ইত্যাদির ব্যবস্থা গ্রহণ কর, জনগণের খাদ্যের ব্যবস্থা কর। সেই সাথে আগামী বর্ষায় পার্টির নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চল যাতে দখল করা যায় সে লক্ষ্য নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী গঠন করার কথা বলা হয়।[৬১]

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পার্টির অবস্থান তুলে ধরার পাশাপাশি আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় যে, '... আপনাদের বাহিনী জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। আপনারা এখনও গ্রামাঞ্চলের সামন্তবাদী শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে চান। এ পথে পূর্ব বাংলার মুক্তি অর্জিত হবে না। আসুন একটি সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী কর্মসূচি নিয়ে, জনগণের বাহিনী গঠন করে, গেরিলা যুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করে প্রথমে গ্রাম বাংলাকে আমরা মুক্ত করি। গ্রাম বাংলার সকল সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক শক্তিকে নিয়ে অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠন করি। শহরে এখন নিতে হবে আত্মরক্ষামূলক কৌশল। শহরে গোপনে গেরিলা বাহিনী গঠন করতে হবে। শহরের চতুর্দিকের শহরতলীতেও গোপন গেরিলা বাহিনী গঠন করতে হবে। গ্রাম বাংলার একটি বড় এলাকা মুক্ত করার পর শহর এবং শহরতলীর শত্রু সেনার উপর গেরিলা অ্যাকশন শুরু করতে হবে, এবং পরবর্তীকালে মুক্ত গ্রামবাংলা থেকে শহর ঘেরাও করে শহর দখল করতে হবে।' আর এ কর্মসূচি ও যুদ্ধ কৌশল নিয়ে পার্টির নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার নীতি গ্রহণ করে। তবে ১৪ এপ্রিল চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ

এন লাই পাকিস্তান সরকারের কাছে 'পাকিস্তান রক্ষা'র যে মৌখিক বার্তা পাঠান তা রেডিওতে শোনার পর পার্টির সেক্রেটারি ৪ এপ্রিলের সম্পাদকমন্ডলীর নির্দেশের ঠিক উল্টোপথ অনুসরণ করেন।[৬২] এখান থেকেই দেখা যায় পার্টির নেতৃত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নিজ নিজ তত্ত্ব অনুসারে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। ফলে দ্বিধান্বিত অবস্থান থেকেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলার নেতা-কর্মীগণ 'মুক্তাঞ্চল রাজনীতি' বা মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির প্রয়াস চালান। গ্রামাঞ্চলে গেরিলা বাহিনী গঠন, এ বাহিনীর মাধ্যমে শ্রেণি শত্রু খতম ও মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল এ প্রয়াসের অন্তর্ভুক্ত। আর এ প্রয়াস চালাতে গিয়ে পার্টির নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, রাজাকার ও মুক্তিবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দলটির আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. তোয়াহার নেতৃত্বে নোয়াখালীর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে।
২. আবদুল হক গ্রুপ।
৩. যশোর জেলা গ্রুপ।
৪. মন্টু মাস্টার ও এবাদ আলীর নেতৃত্বে রাজশাহীর তানোর।
৫. সালাউদ্দীন, ক্যাপ্টেন জাহেদ, ড. তুহীন, প্রাণকুমার ভট্টাচার্য, হাজী বশীরের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের চকোরিয়ায়।
৬. খন্দকার আলী আব্বাসের নেতৃত্বে ঢাকার নবাবপুর থানা ও মানিকগঞ্জের কিছু অঞ্চলে। আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠে।

খ. পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল)

১৯৭১ সালের পূর্বেই পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন সার্বভৌম পূর্ব বাংলা কায়েমের বিপ্লবী রাজনীতিকে প্রধান রাজনৈতিক লাইন হিসেবে গ্রহণ করলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর পার্টির মধ্যে আন্তঃসংযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পার্টির সাংগঠনিক কাজ হয়ে পড়ে স্তিমিত। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা.লে.)-র মতো পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক কমিটিগুলো নিজেদের মতো করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সময় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে ঐক্যবদ্ধ যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি। আবার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দেবেন সিকদার ২৫ মার্চের পর জেল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে ভারতে চলে যান। সেখানে তিনি পার্টির তত্ত্বের বাইরে অবস্থান নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। মে মাসে তিনি বাংলাদেশে এসে পার্টি নেতৃত্ব আলাউদ্দিন আহমেদ ও আবদুল মতিনের সঙ্গে কয়েকদফা বৈঠক করেন।

কিন্তু দু'পক্ষের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেবেন সিকদার বাঙালির জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ের রাজনৈতিক লাইনে অটল ছিলেন আর অন্যপক্ষ পূর্ব বাংলার কৃষক-জনতার দ্বন্দ্ব প্রধান ধরে নিয়ে শ্রেণি শত্রু খতমে লাইনে অটল ছিলেন।[৬৩] ফলে আলোচনায় ঐক্যমত না হওয়ায় ৭ মে দেবেন সিকদার ভারতে ফিরে যান। তাঁর সঙ্গে আবুল বাশার, সিরাজুল হোসেন খান ভারতে অবস্থান নেন। এরপর থেকেই পার্টি স্পষ্টত দুটি লাইনে অগ্রসর হয়- এক অংশ জাতীয় মুক্তির লাইন গ্রহণ করে এবং অন্য অংশ গ্রহণ করে চারু মজুমদারের শ্রেণি শত্রু খতমের লাইন।

এভাবে দেখা যায়, ১৯৭১ সালের ১৪ জুন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের নকশাল নেতা চারু মজুমদারের রাজনৈতিক ও সামরিক লাইনকে পার্টির অন্যতম লাইন হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে তাদের পক্ষে বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করার কোনো সুযোগ ছিল না। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় কমরেড আবুল বাশারের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তত্ত্বকে পার্টি প্রত্যাখান করে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জায়গায় শ্রেণি দ্বন্দ্ব অর্থাৎ আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী সমাজে শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বস্তুত ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকেই পার্টি বিভিন্ন গ্রামে 'কৃষকের বিপ্লবী কমিটি' গঠন করে। দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের প্রাধান্য দিয়ে এসব কমিটি গঠন করা হয়। জুনে পার্টির একটি সার্কুলারে সমর্থক ও জনগণকে সতর্ক করে বলা হয় যে, 'পূর্ববাংলাকে নিয়ে জুয়া খেলা পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশিলেরা আজ পূর্ব বাংলাকে নিয়ে মায়া কান্না শুরু করেছে। পাক-ভারত যুদ্ধের সম্ভাবনা আজ আগের চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সরকার পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ প্রস্তুতিকে রূদ্ধশ্বাস গতিতে বাড়াচ্ছে। ... যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ... যুদ্ধ শুরু হলে আমরা যেন সশস্ত্র সংগ্রাম গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে পারি তার ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাপক অভিযান চালিয়ে গ্রামাঞ্চলে লাল রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিতে হবে। জনগণের সেনাবাহিনী হলো লাল রাজনৈতিক এলাকা টিকিয়ে রাখার গ্যারান্টি।'[৬৪] ফলে দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা. লে.)-র অনুরুপ চারু মজুমদারের শ্রেণি শত্রু খতমের নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্টি নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ লক্ষে আমজাদ হোসেন ও ওয়াজেদ আলীর নেতৃত্বে যশোরে, আবদুল মতিন টিপু বিশ্বাস-আলাউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে

পাবনায়, ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহীতে, বি.এম কলিমুল্লাহর নেতৃত্বে চাঁদপুরে, কামালের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে পার্টির এলাকা বিস্তৃত হয়।[৬৫] এছাড়া কুমিল্লা, কুষ্টিয়া, বগুড়া জেলাসহ বেশ কয়েকটি জেলায় পার্টির সাংগঠনিক এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাবনা জেলা শাখা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল)-র পাবনা জেলা শাখার সম্পাদক ছিলেন টিপু বিশ্বাস। ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের পর টিপু বিশ্বাস ঠিক বুঝতে পারছিলেন না কি করতে হবে। আর পরামর্শ করার মতো কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন অনুপস্থিত।[৬৬] তার ভাষ্য অনুসারে কেন্দ্রীয় নেতারা এসময় ঢাকায় ফজলে লোহানীর বাসভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন।[৬৭] অতঃপর তিনি পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পাক বাহিনীর উপর হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। পাবনার শানিরদিয়াড়কে কেন্দ্র করে তিনি গড়ে তোলেন বিশাল বাহিনী। বাহিনীর প্রধান ছিলেন টিপু বিশ্বাস এবং লেফটেন্যান্ট ছিলেন দু'জন, শহীদ ও মাসুদ। তাঁর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার। টিপু বিশ্বাস পাবনার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে তাঁর এ বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। ইউনিয়নগুলোর মধ্যে ছিল শানিরদিয়াড়, ঘোষপুর, কৃষ্ণদিহার, নাজিরপুর, হেমায়েতপুর, মালিগাছা, গয়েশপুর, মালঞ্চি, আতাইকুলাই, দাপুনিয়া, টিকোরি ইত্যাদি। টিপু বিশ্বাসের ঘোড়া ছিল, যাতে চেপে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করতেন। এছাড়া এ বাহিনীর ছিল নিজস্ব শস্যাগার, গাড়ি, তেলের সংগ্রহ, দেশিয় অস্ত্র ভান্ডার ও বোমা। উপর্যুক্ত অঞ্চলগুলোতে পার্টির নিজস্ব প্রশাসন চালু ছিল। ২৫ মার্চ পাবনার বিসিক অঞ্চলে পাকিস্তান বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয় এবং প্রায় ২৯ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা মুক্ত ছিল। ৫ এপ্রিল টিপু বিশ্বাসের বাহিনী পাবনার ডি.সি নুরুল কাদেরের অফিস ঘেরাও করে তিন দফা দাবি পেশ করে, ১. অস্ত্র প্রদান। ২. খাদ্য ঘর (গুদাম ঘর) জনগণের জন্য খুলে দেয়া এবং ৩. প্রশাসনের হেডকোয়ার্টার গ্রামে স্থানান্তর করা। অবশ্য তিনি উক্ত বাহিনীকে কোনো সাহায্য না করায় পার্টি কর্মীরা ২২টি বেটাগান (এলএমজি) এবং গোলাবারুদ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তবে টিপু বিশ্বাস মনে করেন, এ সময় তারা যে চারু মজুমদারের শ্রেণিশত্রু খতম লাইন নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তা ছিল ভুল। যুদ্ধের শেষের দিকে নভেম্বর নাগাদ পাবনার বিভিন্ন অঞ্চলে মুজিব বাহিনীর সাথে পার্টির সদস্যদের সংঘর্ষ হলে উভয় পক্ষই

হতাহতের সম্মুখীন হয়। পাশাপাশি পার্টির নিয়ন্ত্রিত এলাকা ভেঙ্গে পড়ে।[৬৮]

আত্রাই

বৃহত্তর রাজশাহী জেলার পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারীদের একটা অংশ দলের তত্ত্ব প্রত্যাখান করে। তারা আওয়ামী লীগের সাথে ফ্রন্ট স্থাপন করে একসাথে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি/রাজশাহীর আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রধান ওহিদুর রহমান বলেন, 'চীনপন্থি হওয়া সত্ত্বেও নওগাঁর দক্ষিণাঞ্চল, নাটোরের উত্তরাঞ্চল এবং রাজশাহীর পূর্বাঞ্চলে বাহ্যিকভাবে ন্যাপ ও কৃষক সমিতি, গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি করলেও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আওয়ামী লীগের সাথে কখনো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়নি।'[৬৯] ১৯৭১ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আত্রাই থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। উক্ত পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- ড. সিরাজউদ্দীন, ডা. আবদুল খালেক, তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (ন্যাপ মোজাফ্ফর), আবুল হাসেম, বাদল দত্ত, আফতাব উদ্দীন মোল্লা (ভাসানী ন্যাপ), ওহিদুর রহমান (ভাসানী ন্যাপ), খায়রুল ইসলাম, বেলাল হোসেন ও সাজেদুর রহমান দুদু।[৭০]

আবার মূল পার্টির সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় এপ্রিলের মাঝামাঝিতে 'আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি' নামে একটা অংশ একত্রিত হয়। এর সাত সদস্য বিশিষ্ট অ্যাডহক কমিটির প্রধান ছিলেন ওহিদুর রহমান। পরবর্তী পর্যায়ে আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত বাহিনীতে পার্শ্ববর্তী থানাসমূহ থেকে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ যুক্ত হতে থাকলে পার্টির নাম পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ কারণে মে মাসের দিকে 'রাজশাহীর আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি' নামে অপর একটি আঞ্চলিক দল গঠনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং 'আত্রাই কমিউনিস্ট পার্টি'-এর সাথে অঙ্গীভূত হয়। আঞ্চলিক পার্টির অ্যাডহক কমিটির সদস্য ছিলেন ১১ জন। এখানেও পার্টির প্রধান হন ওহিদুর রহমান।[৭১] ফলে এ বাহিনী ওহিদুর বাহিনী নামেও পরিচিতি লাভ করে। বাহিনীর কমান্ড ইউনিটে তিনটি স্তর পরিলক্ষিত হয়: প্রথম স্তরে ছিল আধা-সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রক শাখা, যা হাই কমান্ড নামে অভিহিত হতো। দ্বিতীয় স্তর ছিল সমন্বয়ক শাখা এবং তৃতীয় স্তরে ছিল গ্রুপ কমান্ড। এক একটি গ্রুপ প্রায় ১০-৩০ জন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত হতো। এছাড়া সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধাগণ প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিলেন- রেগুলার ফোর্স, রিজার্ভ ফোর্স ও কম্বাইন্ড ফোর্স। এছাড়াও বাহিনীতে অ্যালাইড ফোর্স, ম্যানেজিং ফোর্স ও ভোলান্টিয়ার ফোর্স হিসেবে সহস্রাধিক অবৈতনিক

কর্মী নানাবিধ কাজে নিয়োজিত ছিলেন।[৭২]

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল রাজশাহীর আত্রাই থানার তেতুঁলিয়া গ্রামে কমিউনিস্টদের একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আবুল বাশারের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের চিন্তার সাথে সকলে একমত হন। শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে যে দিকনির্দেশনা ছিল তার একটি পর্যালোচনার ভিত্তিতে শেখ মুজিবের বক্তব্যকে সঠিক ও যুগোপযোগী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ২৫ মার্চ রাতের অপারেশন সার্চলাইটের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের লড়াইকে প্রধান সমস্যা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি আসন্ন প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য রেড আর্মির আদলে একটি বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭৩] মুক্তিযুদ্ধকালে ওহিদুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠা এই আঞ্চলিক বাহিনীতে প্রায় দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধা ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনা করেন।

ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আলী খাজা এক কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধার কমান্ডার রাজশাহী জেলার পূর্বাঞ্চলে অপারেশন পরিচালনার জন্য রাজশাহীর আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগীতা কামনা করেন। একই সাথে নাটোর সদরের গ্রুপ কমান্ডার রমজান ও লুৎফর রহমান আঞ্চলিক গেরিলাদের সাথে নিয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তাব দিলে দলটির হাই কমান্ড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যৌথ আক্রমণ সম্মতি জ্ঞাপন করে। রাজশাহী সদরের আব্দুস সালাম (এফএফ) গ্রুপও উক্ত বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে অপারেশন পরিচালনা করে।[৭৪]

কালিগঞ্জ (যশোর)

১৯৭১ সালে কালীগঞ্জে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণি শত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের ৬ অক্টোবর স্থানীয় নলডাঙ্গায় জনৈক চান্দ আলী মিয়াকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেয়ার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে শ্রেণিশত্রু কার্যক্রম আরম্ভ হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পুরো নয় মাস কালীগঞ্জ রাজনৈতিকভাবে পার্টির নিয়ন্ত্রণেই ছিল। এখানকার পার্টির কমান্ডার ছিলেন রফিকুল ইসলাম এবং তাঁর পলিটিক্যাল কমিশনার ছিলেন আবদুস সালাম। পার্টির প্রায় একশ সশস্ত্র যোদ্ধা এ অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। '৭১ সালের শেষের দিকে হাতেম আলী ও ওলাদ হোসেনের নেতৃত্বে কালীগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবেশ করে। তাদের সঙ্গে পার্টির গেরিলাদের ছোট ছোট সংঘর্ষ বাঁধে। ১৬ ডিসেম্বরের পর

কমিউনস্টগণ আত্মগোপনে চলে যান।[৭৫]

গ. বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান নেয়া দেবেন সিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ১৯৭১ সালের ৩০ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি কর্মসূচি তৈরি করেন। তাতে বলা হয়, 'পূর্ববাংলার মেহনতী জনগণ ও তার সন্তানদের দ্বারা গঠিত মুক্তিবাহিনীই ছিল এ যুদ্ধের নিয়ামক শক্তি। আগামী দিনেও স্বাধীন সুখি-সমৃদ্ধশালী সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনে একই নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে। ... দেশী-বিদেশী শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসন ও শোষণ থেকে জনগণকে অবশ্যই মুক্ত করতে হবে, নতুবা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বিঘোষিত শোষণহীন সমাজ হবে অর্থহীন। ... প্রথমত, দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে আনতে হবে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা। ... দ্বিতীয়ত, সকল স্তরের মুক্তিফৌজকে নিয়ে একটি নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। তৃতীয়ত, দেশের অভ্যন্তরে ছোটবড় সকল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণার্থে একটি সামগ্রিক কর্মসূচী প্রণয়ন করা।' এছাড়া বলা হয়, রাষ্ট্রের নাম হওয়া উচিত জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা।[৭৬] এরপূর্বে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'-তে যোগদান করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। সংগঠনের সশস্ত্র তৎপরতা প্রধানত নোয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এ সংগঠনের অন্যতম নেতা বিএম কলিমুল্লাহ'র নেতৃত্বে চাঁদপুরে একটি বাহিনী ও ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে ওঠে।[৭৭]

৩. না চীন না মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পল্টনে তাদের প্রথম প্রকাশ্য জনসভা করে। সভায় কাজী জাফর আহমেদ, রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভা থেকে ঘোষণা করা হয় যে, মুজিব ইয়াহিয়ার বৈঠক ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে কমিটি জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানায় এবং জনসভা থেকেই গ্রামে সশস্ত্র মুক্ত ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়। ঐদিন রাতেই পাক বাহিনীর বর্বর আক্রমণ পরিচালিত হয়। ২৭ মার্চ কারফিউ উঠে গেলে নেতৃবৃন্দ নরসিংদীর শিবপুরে চলে যান। নেতৃবৃন্দকে এসময় নিজের গাড়িটি দিয়ে সাহায্য করেন জহির রায়হান। গাড়িটি যুদ্ধের গোটা সময়টাতেই

শিবপুরে ছিলো।[৭৮] সেখানে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে ইতঃমধ্যেই বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির কর্মীদের সামরিক ট্রেনিং চলে। ঐ সময় থানার সব কয়টি রাইফেল ছিনিয়ে নেয়া হয়। রাতেই শিবপুরে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় শিবপুর হবে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য দলের প্রধান ঘাঁটি। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এই গ্রুপটি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। তারা বাংলার জনগণের জাতীয় আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নরসিংদী জেলায় মান্নান ভূঁইয়ার, বাগেরহাটে রফিকুল ইসলাম খোকনের এবং সাতক্ষীরার কামেল বখতের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনী। তারমধ্যে সবচেয়ে বড় ঘাঁটি ছিল নরসিংদীর শিবপুর।

যুদ্ধকালে সমন্বয় কমিটির সাংগঠনিক নীতি ছিল দুটি: ১. যেখানে সম্ভব বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারি বাহিনীতে যোগ দিয়ে তাদের নির্দেশ মান্য করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা এবং ২. কোথাও তেমন বাহিনী না থাকলে, কিংবা দলীয় সংকীর্ণতার কারণে যোগদান সম্ভব না হলে আলাদাভাবে 'গেরিলা ফৌজ' গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনা করা। উল্লেখ্য পার্টির নেতৃত্বাধীন বাহিনীর নাম ছিল 'গেরিলা ফৌজ'। এর গঠন প্রণালী ছিল- পাঁচ থেকে সাতজন নিয়ে একটি গ্রুপ, কয়েকটি গ্রুপ নিয়ে একটি স্কোয়াড এবং কয়েকটি স্কোয়াড নিয়ে গঠিত হতো এক একটি আঞ্চলিক ইউনিট। নিম্নে সমন্বয় কমিটির অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ ইউনিটগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:[৭৯]

১. ঢাকা জেলার শিবপুর, মনোহরদী, রায়পুর ও কালিগঞ্জ নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার।
২. কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ অঞ্চল। এখানে গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার।
৩. টাঙ্গাইলে প্রথম দিকে গেরিলা নেতা কাদের সিদ্দিকীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হলেও পরে মতৈক্যের ভিত্তিতে পার্টির প্রায় পাঁচ হাজার যোদ্ধা অংশ নেন।
৪. খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় সৈয়দ কামেল বখতের নেতৃত্বে প্রায় ২ হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে, এছাড়া বাগেরহাট সদর, বিষ্ণুপুর, রঘুনাথপুর প্রভৃতি এলাকায় গেরিলা ফৌজের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার।

৫. রাজশাহী জেলার আত্রাই অঞ্চলে আফতাব মোল্লার নেতৃত্বে প্রায় দু'হাজার সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে পার্টির গেরিলারা স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবশ্য এ অঞ্চলে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ওহিদুর রহমানের সাথে পার্টির সদস্যদের সংঘাত হয়।
৬. ফরিদপুরের বোয়ালমারী এবং মাদারীপুরের একট অঞ্চলে মিয়া সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে।
৭. চট্টগ্রাম শহর ও রাউজান এলাকায় শামসুল-আলমের নেতৃত্বে কয়েকশত সদস্যের গেরিলা ফৌজ গড়ে ওঠে। এখানে মুক্তিবাহিনী বা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়নি। এখানে পার্টির গেরিলারা প্রধানতঃ চট্টগ্রাম শহর এলাকায় গেরিলা তৎপরতা পরিচালনা করেন।
৮. নোয়াখালীর ফেনী অঞ্চল গড়ে ওঠে কয়েকশত সদস্যের এক গেরিলা ফৌজ।

সমন্বয় কমিটির গেরিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কয়েকজন সামরিক অফিসার সহযোগিতা করেন। তাঁরা হলেন- মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবুল মঞ্জুর, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এম এ জলিল। তাঁরা ছাড়াও মেজর হায়দার, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন এনাম, ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম ছিলেন। কাজী জাফর আহমদ-এর মতে, উপর্যুক্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতা ব্যতীত পার্টির কর্মীদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ত। প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাঁরা অস্ত্রের ব্যবস্থাও করতেন।[৮০]

মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাহিনী শিবপুরে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তার ওপর আগস্টের শেষ দিকে কাজী গোফরান আগরতলা থেকে শিবপুরে আসেন। সঙ্গে করে আনেন 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'র ঘোষণা ও প্রচারপত্র। এছাড়া ছিল 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি'র সার্কুলার। এরই ভিত্তিতে নৌকা ঘাটা প্রাথমিক স্কুলের মাঠে শিবপুর থানা ভিত্তিক একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্প থেকে দশজন করে প্রতিনিধি এবং এলাকা ভিত্তিক কৃষক সমিতির প্রতিনিধিদের সভায় আনা হয়। সেই সাথে রায়পুরা, মনোহরদি ও কালীগঞ্জের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল

মান্নান ভূঁইয়া। উক্ত সভায় 'বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণা ব্যাখ্যা করা হয় এবং আশু করণীয় ও চূড়ান্ত লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। আশু করণীয়র মধ্যে ছিল গেরিলা যুদ্ধের কৌশল, ঘাঁটি এলাকায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি। পাশাপাশি শহর অঞ্চলে শত্রুকে 'ঝটিকা আঘাত করো ও সরে পড়ো'- লড়াইয়ের কৌশলের কথা বলা হয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বলা হয় যে, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হানাদারমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।[৮১]

শিবপুরের গ্রামাঞ্চল প্রায় ৯ মাসই মুক্ত ছিল। এখানে এক ধরনের জনপ্রিয় গণপ্রশাসন তৈরি হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের শিবপুরে বিভিন্ন ক্যাম্পে ভাগ করে দেয়া হয়। জয়নগর, কামরাবো, কোদাল কাটা, ইটনা প্রভৃতি জায়গায় ক্যাম্প করা হয়। এছাড়া দড়িয়াপুর মহির ট্যাংকে একটা ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয়। শিবপুর থেকে দুইবার ভারতে দুটি গ্রুপ পাঠানো হয় ট্রেনিং এবং অস্ত্রের জন্য। পাশাপাশি উদ্দেশ্য ছিল যাতে শিবপুর সম্বন্ধে বিভ্রান্তি দূর হয়ে সরকারি মুক্তিফৌজ তাদেরকে স্বীকৃতি দেন। এ অংশ দু'বার সামান্য ট্রেনিং এর পর তারা পেয়েছিলেন কিছু স্টেনগান ও প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক। শিবপুরে সমন্বয় কমিটি শুধু সংগঠন হিসেবে যুদ্ধ করেনি, বরং যুদ্ধের পাশাপাশি তাদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে অন্যান্য অঞ্চলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমিউনিস্টরা প্রায়ই এ অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিতেন। শিবপুরের বাহিনীর সামরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন মজনু মৃধা, নেভাল সিরাজ, হায়দার আকবর খান জুনো, আবদুল আলী মৃধা, আওলাদ, মান্নান খান, হান্নান ভূঁইয়া প্রমুখ। সামরিক কমান্ডো এবং পাকবাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে যারা অংশ নেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন- হায়দার আনোয়ার খান জুনো, মান্নান খান, আওলাদ হোসেন খান, তোফাজ্জেল হোসেন, ঝিনুক, কাঞ্চন, আবদুল আলী মৃধা, সামসুজ্জোহা মিশন, সেন্টু, রশিদ মোল্লা, আমজাদ, রমিজউদ্দিন, হাবিব, মহাম্মদ হোসেন খান প্রমুখ। অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন রব খান, বশিরউদ্দিন খান, তোফাজ্জেল হোসেন, তোফাজ্জল ভূঁইয়া, কালা মিয়া, শহীদুল ইসলাম, খালেক, নুরুল ইসলাম, বাতেন ফকির, রণজিৎ, বাসু, প্রমুখ।[৮২] শিবপুরে বড় ধরনের সামরিক অভিযান আরম্ভ হয় জুন মাসে। নভেম্বর মাসে শিবপুরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকবাহিনীর ওপর বার বার আক্রমণ চালায়। এ মাসেই শিবপুর মুক্ত হয়। একাত্তরের রণাঙ্গন হিসেবে শিবপুরের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল:[৮৩]

১. শিবপুরে ভারতীয় সাহায্য আসেনি বললেই চলে। দুদফায় দুটো টিম গিয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু সামান্য কিছু বিস্ফোরক ছাড়া তেমন কোনো অস্ত্র তারা পাননি।
২. শিবপুরে কোনো রাজাকার তৈরি হয়নি।
৩. চীন-ভিয়েতনামের মতোই প্রায় আদর্শ কমিউনিস্ট গেরিলা অঞ্চল হিসেবে গড়ে ওঠেছিল শিবপুর, যার থানা হেডকোয়ার্টার বাদে বাকি সবটাই ছিল প্রায় মুক্ত এলাকা।
৪. তৎকালীন বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলের চেয়ে শিবপুর ছিল অনেক বেশি সুশৃংখল। চুরি, ডাকাতি প্রায় ছিল না বললেই চলে।
৫. শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বে বাম কমিউনিস্টগণ থাকলেও আওয়ামী লীগ তা মেনে নেয়।

শিবপুর ছাড়া সমন্বয় কমিটির আরও দুটি ঘাঁটি ছিল কলকাতা ও আগরতলায়। কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন ও হায়দার আকবর খান জুনো ঘাঁটি দুটির দায়িত্বে ছিলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমন্বয় কমিটি ও দুই ধরনের কৌশল অবলম্বন করে- ১. দেশের মধ্যে মুক্ত ও গেরিলা ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা, ২. সরকারি মুক্তিফৌজের মধ্যে থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। হায়দার আকবর খান রনোর মতে, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে মুক্তিফৌজের একটা দ্বন্দ্ব ছিল। মুক্তিফৌজের নেতৃত্বে ছিলেন সেক্টর কমান্ডারগণ। এই দ্বন্দ্বের সুযোগে বিভিন্ন ক্যাম্পে সমন্বয় কমিটির ক্যাডারদের ঢুকিয়ে দেয়া হতো। সমন্বয় কমিটির পক্ষে সেক্টর কমান্ডার বা বাঙালি সামরিক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ব্যারিস্টার মনসুর আহমদ। এভাবে দেখা যায় খালেদ মোশাররফের অধীনস্ত ঢাকার 'ক্র্যাক প-াটুন'- এর অধিকাংশ ছিলেন 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটি'র সঙ্গে সংশিষ্ট বা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। যুদ্ধের সময় খালেদ মোশাররফ ছাড়াও মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর মনজুর আহমদ, কর্নেল জামান প্রমুখের সঙ্গে সমন্বয় কমিটির যোগাযোগ গড়ে ওঠে।[৮৪]

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে সারাদেশে ১৪টি ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে যারা রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আবদুল্লাহ্ আল নোমান (চট্টগ্রাম); গিয়াসউদ্দিন নান্নু ও দিলীপ সুর (ফেনী); কাজী আফতাবউদ্দিন গেদু মিয়া, হাবিবুর রহমান, নাজাদ, কুদ্দুস মিন্টু (কুমিল্লা), সুনীল লৌহ (সিলেট), বুলবুল খান মাহবুব; ইকবাল হালিম (টাঙ্গাইল); শাহ আলম,

আবদুস সাত্তার (বরিশাল); ফজলু (পিরোজপুর); আফতাব মোল্লা (নওগাঁ), শাহ তৈয়বর রহমান (বৃহত্তর রংপুর); আমিনুল ইসলাম, সামাদ চৌধুরী, মাহমুদ হাসান মানিক, সাঈদ ইসকান্দার (দিনাজপুর) প্রমুখ। এছাড়াও কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি ও দলটির ছাত্রফ্রন্ট বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন প্রবাসী সরকারের মুক্তিফৌজের ভেতরে থেকেও সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেয়। এক্ষেত্রে ঢাকার 'ক্র্যাক পাটুন' এবং খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন মেঘালয় ক্যাম্পে তাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সমন্বয় কমিটি ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের যারা ক্র্যাক পাটুনে বিশেষ সাহসী ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে শহীদুল্লাহ খান বাদল, বদি, আশফাকুস্ সামাদ, মাসুদ, রুমী, সাদেক হোসেন খোকা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৮৫]

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলমান স্নায়ুযুদ্ধপর্বে একটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। সমসাময়িক বিভিন্ন লেখনী থেকে আমরা এ সম্পর্কে স্পষ্ট চিত্র পাই। এমনকি বৃহৎ শক্তিবর্গ স্পষ্টত দুটি অবস্থান গ্রহণ করে। তারমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারত ও কিছুটা সময় পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত নেতৃবৃন্দদের ওপর যেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি, তেমনি পারেননি ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। আবার চীনপন্থি কমিউনিস্টগণ চীনের সাথে কোনোপ্রকার যোগাযোগ না করেই দেশটির অনুরূপ নীতি গ্রহণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদা বাংলাদেশের প্রশ্নটি ভারতের আগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবেই মূল্যায়ন করেছে। আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের জন্য তৈরি করে নানামুখী অবস্থান। তারমধ্যে একটি অবস্থা ছিল বাংলাদেশের যুদ্ধে কমিউনিস্টদের অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করা। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্যগুলো আগে থেকেই কমিউনিস্ট মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এরমধ্যে প্রায় প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। এভাবে দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণির কাছে বিভিন্নভাবে আগ্রহের স্থান লাভ করে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নীরবতা অবলোকন করে ইন্দিরা গান্ধি বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভারতীয় দূতাবাসগুলোর মাধ্যমে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। বস্তুত পাকিস্তান-বাংলাদেশ সংকটে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে

ভারতে। বাংলাদেশের তিন দিকেই ভারতের সীমান্ত। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরণার্থীরা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অবস্থান নেয়। দিন যত বাড়তে থাকে শরণার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এত বিশাল পরিমাণ শরণার্থীর দায়িত্ব নেয়ার মতো অবস্থা ভারত সরকারের ছিল না। এছাড়া রাজনৈতিকভাবেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারত সরকারকে সংকটের মধ্যে ফেলে- এক. ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে তা এ যুদ্ধ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করবে, এবং দুই. সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার কমিউনিস্টরা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একত্র হয়ে যুক্ত বাংলা গঠনের চেষ্টা করবে। কারণ ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় কমিউনিস্টরা যুক্ত বাংলার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তাছাড়া দু'অঞ্চলের কমিউনিস্টরা প্রায় একই মতানুসারে বিভক্ত ও আন্দোলন পরিচালনাকারী। মস্কো বা চীনপন্থি যে কোনো একটি গ্রুপ বাংলাদেশে সফলতা লাভ করলে তা ভারতকে দারুণভাবে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করবে। এমনকি তা ভারতের অখণ্ডতার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তিন. উত্তেজনাকর অবস্থায় কোনো কারণে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে গেলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তি ও ত্যাগের প্রশ্নটি হারিয়ে যাবে। এ সম্পর্কে সমর সেন জাতিসংঘে স্পষ্ট করেই বলেন যে,

'There was a great huge and cry to internationalise the problem: diplomatic moves, various moves in the United Nations through these propolals for observers, and this, that other all designed to make it into an Indo-Pakistan dispute. Once it turned into an Indo-Pakistan dispute, people will forget what the Pakistan Army is doing in East Pakistan. They can go on burning their villages, raping their women and so on. People will then forget and say that it is an Indo-Pakistan dispute. It is extraordingry, therefore, to find that today, when pressure for action is so great in some quarters, this back-ground is forgotten.'[৮৬]

সমস্যার গভীরতা অনুধাবন করে ইন্দিরা গান্ধী তাই শরণার্থী সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্ব সফর করেন এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট তা সমাধানের আহ্বান জানান। উত্তরে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১ এপ্রিল সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।[৮৭] ভারত সরকারকে

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি যেমন বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ায় তেমনি চীনপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিও পক্ষে অবস্থান নেয়। তাঁরা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে, জনসভা করে এবং বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে ভারত সরকারের নীতিকে বাংলাদেশের সংগ্রামের পক্ষে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তিনভাগে বিভক্ত ছিল:

১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি- সিপিআই, মস্কোপন্থি
২. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি- (মার্কসবাদী)- সিপিএম চীনপন্থি
৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি- (এম.এল)- নকশালবাদী

আন্তর্জাতিক লাইনকে কেন্দ্র করে দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ার পাশাপাশি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন চারু মজুমদারের নীতিকে কেন্দ্র করে আরও একভাগে বিভক্ত হয়। আর বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রতিটি গ্রুপ আলাদাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অবশ্য শুধু যে দলগতভাবে তারা ভূমিকা পালন করেছে তা নয়, বাংলাদেশের সমর্থনে সিপিআই ও সিপিএম অন্যান্যদের সাথে একত্র হয়েও কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন, মার্চের ৩০ ও ৩১ তারিখে কলকাতায় সিপিআই, সিপিএম, কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলগুলো একত্র হয়ে গঠন করে 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতি' 'বাংলাদেশ সংহতি ও সাহায্য কমিটি'। মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় তারা শরণার্থীদের সাহায্য দান, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান, বিশ্বজনমত গঠন, মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ও অস্ত্র সরবরাহ প্রভৃতি প্রশ্নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এম.এল অংশ পুরোপুরিভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট (সিপিআই) পার্টি একেবারে শুরু থেকেই সমর্থন দান করে। ২৭ মার্চ লোকসভায় কমিউনিস্ট নেতা হীরেন মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সহস্রধারে বাংলাদেশের রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তার অপরাধ যে বাংলাদেশের জনগণ প্রায় অভূতপূর্ব এক বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছেন এবং যারা জঙ্গলের আইন ছাড়া আর কিছুই জানে না তারাই এদের শাস্তি দেবার চেষ্টা করছে।[৮৮] কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্য থেকে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে পার্টির অবস্থান স্পষ্টভাবে অনুমেয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সংগ্রাম ইতিহাসে বস্তুতঃই অনন্য। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয় মুক্তির এরূপ সংগ্রাম অভূতপূর্ব।

কারণ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে অনুরূপ সংগ্রাম এভাবে দেশের সমগ্র সাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। বাংলাদেশের এই মুক্তি সংগ্রামের পটভূমি বিশ্লেষণ করে সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কাছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি যে আবেদন প্রেরণ করেছে তা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকল কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। ঐ সকল পার্টিগুলো আজ বাংলাদেশের সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছে।[৮৯] মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকেই এদেশের মানুষের মুক্তি সংগ্রামে একাত্মতা জানায়। দলটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিষয়টি অনুধাবন করে নিজ সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সিপিআই স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নে ভারত সরকারকে **১৯৭১** সালের ২৬ মার্চ তারিখেই আহ্বান জানায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই (এম)-এর ভূমিকা নিয়ে নানা বিতর্ক রয়েছে। সাধারণ ভারতীয়রা বিশ্বাস করে দলটি ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী, জ্যোতি বসুর ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।[৯০] তবে সার্বিক সময়ট অবলোকন করলে দেখা যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সিপিআই (এম)-এর অবস্থান ছিল মূলত কৌশলগত। দলের আদর্শ চীনপন্থি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সংগ্রামে তাদের ইতিবাচক ভূমিকা সন্দেহের উদ্বেগ করে। সিপিএম-এর মিছিলের স্লোগান ছিল- 'ইন্দিরা ইয়াহিয়া এক হ্যায়'; 'বাঙলাদেশে মানুষ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়ছে, পশ্চিম বাঙলার মানুষও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়ছে- সুতরাং দুই বাংলার লড়াই এক'; 'ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাঙলাকে দিল্লীর উপনিবেশে পরিণত করার চক্রান্ত করছে।' প্রশ্ন তোলা হয়েছিল- 'যে সরকার নিজের দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করছে সে কী করে অন্য দেশের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য করবে?' দেয়ালে লেখা হয় 'গণতন্ত্র নিধন যজ্ঞের পুরোহিত ইন্দিরা সরকার কখনই বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মদত দিতে পারে না।' এছাড়া সিপিএম-এর তত্ত্ব অনুযায়ী ভারতবর্ষের সরকার বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত। সুতরাং সে নিজ শ্রেণিস্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বা দালাল হতে বাধ্য। এ রকম সরকার গণতন্ত্রকে সংকুচিত এবং শেষপর্যন্ত নিধন করতে চাইবে। অতএব এমন কোনো সংগ্রামকে, তা সে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেই হোক না কেন, সে সাহায্য করবে না যা স্বাধীনতার জন্য বা গণতন্ত্রের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হবে।[৯১] আবার বাংলাদেশ প্রশ্নে সিপিএম চীনের ভূমিকার সমালোচনা করলেও দলটির আশা ছিল চীন তার মনোভাব পাল্টাবে। চীনের নীতি

সাময়িক। বাংলাদেশ প্রশ্নে চীন ও আমেরিকাকে একই ব্র্যাকেটে ফেলা ঠিক হবে না।[৯২] সিপিএম সম্পর্কিত এরূপ ধারণার পাশাপাশি সিপিএম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করে কৌশলপূর্ণ মতামত প্রদান করে। তাছাড়া 'বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সমন্বয় কমিটি'- গঠনে সিপিএম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ভারত ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন জানায়। কিউবা, আমেরিকা, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, ফ্রান্স প্রমুখ দেশের পার্টিগুলো বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে ব্যাপক প্রচার এবং অর্থ সংগ্রহ করে। **১২** থেকে **১৯** জুন পর্যন্ত বার্লিনে অনুষ্ঠিত জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ৮ম পার্টি কংগ্রেসে যোগদানকারী অধিকাংশ প্রতিনিধিই বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা বাংলাদেশকে সম্ভবপর সমস্ত রকম সাহায্য দিতেও প্রস্তুতের কথা ঘোষণা করে। **১৩** জুন ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ট্রাফেলগার স্কোয়ারে বাংলাদেশের সমর্থনে জনসভার আয়োজন করে।[৯৩]

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব জনমত বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর মতামত জানতে এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার উদ্দেশ্যে সিপিআই-এর সদস্যগণ বিভিন্ন দেশে যান। সেখান থেকে ফিরে তাঁরা মন্তব্য করেন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের পরিস্থিতির মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন।[৯৪]

উপসংহার

বাংলাদেশের মুক্তির আন্দোলন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবর্তিত হয়। এযাবৎকালে যেখানে যতো মুক্তির আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেখানে বৈদেশিক শক্তির প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কারণে তা জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। কারণ একই দেশের ভেতর কোনো শাসকশ্রেণি জাতিগতভাবে কাউকে সাধারণত আঘাত করে না বলেই তা জাতীয় চরিত্র লাভ করে না। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে বাঙালি জাতি হিসেবে আঘাত করে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগণ পূর্ববঙ্গের স্থানীয় শোষক ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিদেরও তাদের শোষণের অংশীদার করতে রাজী ছিল না - যা ছিল নগ্ন ঔপনিবেশিক শোষণের চেহারা। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ইতিহাস

বলে যে, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই উপনিবেশগুলোকে সামগ্রিকভাবে শোষণের বদলে উপনিবেশগুলোর ধনিকশ্রেণির একাংশের সাথে মিলিতভাবে যৌথ শোষণের কায়দা গ্রহণ করে। কিন্তু পাকিস্তান এ নিয়মেরও ব্যত্যয় ঘটায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যেমন সারা পৃথিবী লুণ্ঠন ও শোষণের ফসল নিয়ে ব্রিটেনের ধনতন্ত্র সুরক্ষিত রেখেছিল, তেমনি পাকিস্তানী শাসকরাও পূর্ববাংলাকে শোষণ ও লণ্ঠন করে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রশাসনে, জাতীয় আয়ের বন্টনের প্রশ্নে, ভাষায়, জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে, ব্যবহারে ও মনোবৃত্তিতে পুরনো মডেলের সাম্রাজ্যবাদীদের মতো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সামনে প্রতিহত হয়েছে। ফলস্বরুপ মুক্তির সংগ্রাম।[৯৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রূপ পর্যালোচনা করে স্পষ্টত যে চিত্রটি ফুটে ওঠে তা হলো শোষকের শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম। আর তাই এদেশের কমিউনিস্ট দলগুলোর একটা বৃহৎ অংশ সংগ্রামে অংশ নেয়। আর এক অংশ বিভ্রান্তের জালে তা ভিন্নভাবে পরিচালনা করে।

১৯৬৬-৬৭ সাল থেকেই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) সশস্ত্র যুদ্ধের লাইন গ্রহণ করে। পার্টির নেতা-কর্মীরা জানতেন সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করতে হবে। আর এ পক্ষে আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পার্টির যে রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করে তাতে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করা হয় 'জাতীয় গণতান্ত্রিক অর্থাৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক' আর প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হয় মার্কিন, রাশিয়া ও ভারতের শাসকগোষ্ঠীকে। প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে নির্ধারণ করা হয় কৃষক-জনসাধারণের সাথে সামন্তবাদের দ্বন্দ্ব। অথচ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব যেখানে প্রধান শত্রু মার্কিন, রাশিয়া ও ভারত সেখানে প্রধান দ্বন্দ্ব কৃষকের সাথে সামন্তবাদ কি করে হয়। অর্থাৎ বিপ্লবের স্তর জাতীয় গণতান্ত্রিক ও প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ হওয়ায় পার্টির প্রধান দ্বন্দ্ব নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত হয়নি। দেবেন সিকদারের মতে, 'যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হতো, তার শাসন ক্ষমতায় যদি থাকতো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট-মুৎসুদ্দী সামন্ত শ্রেণি, তাহলে বিপ্লবের স্তর হতো নিঃসন্দেহে জনগণতান্ত্রিক। সেখানে প্রধান দ্বন্দ্ব কৃষক বনাম সামন্তবাদ।'[৯৬] ফলে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বললেও তত্ত্বগত ত্রুটির কারণে পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম যথাযোগ্য ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

এক অংশ নির্বাচনের পক্ষে তো অপর অংশ বিপক্ষে। পিকিংপন্থিদের একাংশ পক্ষে থাকলেও তাদের নির্বাচনী কৌশল ও প্রচরণা তেমন জোড়ালে ছিল না। পাকিস্তানি শোষকচক্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে সাধারণ মানুষের দ্বারে কমিউনিস্টরা উপস্থিত হতে পারেন নি। বিপরীতে শেখ মুজিবুর রহমান পুরো বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন ৬-দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য। তাঁর নির্বাচনী সফরসূচি থেকে একথা স্পষ্ট যে নির্বাচনে ৬-দফার পক্ষে তিনি ম্যান্ডেট পেতে কতটা জনমুখী প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি সমাবেশগুলোতে ঘোষণা করেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাঁর দল দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করবে। এদেশে ধনীকে ধনী এবং গরীবকে গরীব হতে আর দেয়া হবে না। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে বৈষম্যের অবসান করে এক শোষণমুক্ত সুখী সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা কায়েমে তাঁর দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।[৯৭] স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনের ফলাফলে এ যথাযথ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অথচ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যাদের রাজনৈতিক ধ্যান-জ্ঞান তারা ব্যস্ত থাকলেন জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যেকার টানাপোড়নে। সাধারণ মানুষ যখন বিপর্যস্ত তখন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে অবস্থার সাধারণ মূল্যায়ন বেশি কার্যকর। আর এ কারণেই '৭০ এর নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে যখন জটিলতা সৃষ্টি হয় তখন শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে চলতে থাকা অসহযোগ আন্দোলনে মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি অংশ নেয় এবং দলটি ভেতরে ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর চীনপন্থিদের অবস্থান ছিল ভিন্ন। তারা কেউই অনুমান করেননি যে ভূট্টো-মুজিব বৈঠক ব্যর্থ হবে। ২৫ মার্চের পর তাই চীনপন্থি দল ও গ্রুপগুলো মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে বিশৃংখল অবস্থায় পড়ে। ফলে আঞ্চলিকভাবেই তারা যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণ করেন। তবে চীনপন্থিদের একাংশ ভারতে অবস্থান নিয়ে একটি জোট গঠন করে। যার নাম দেয়া হয় জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। এ অংশটি বাংলাদেশে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনপন্থি বলে তাদের ব্যাপক সন্দেহ করা হতো। অনেকের মতে সমন্বয় কমিটির মুখ্য সংগঠক মসিউর রহমান (যাদু মিঞা) ছিলেন ইয়াহিয়ার চর। এছাড়া সমন্বয় কমিটির প্রধান হিসেবে মওলানা ভাসানীর নাম ঘোষণা করা হলেও কমিটি গঠনের পরদিন ভাসানী নিজের নাম কাটিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করেন।[৯৮] মস্কোপন্থি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি সমন্বয় কমিটিকে বিভেদপন্থি হিসেবে প্রচার করে।

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশ সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রচেষ্টার বিরোধীতা করেন। প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী কামরুজ্জামানও সমন্বয় কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াকে বিভেদপন্থি বলে আখ্যা দেন।[৯৯] যুদ্ধকালীন দলগুলোর সময়ের এহেন অবস্থান যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে সংকটের সৃষ্টি করে।

আবার **১৯৭১** সাল পর্যন্ত যারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল নেতৃত্ব পরিচালনা করতেন তাদের প্রায় সকলেই একসময় ছিলেন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে। যুগান্তর, অনুশীলন অথবা সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ থেকে তারা বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের সময় তারা তত্ত্বগতভাবে সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করলেও তাদের মানসিকতা থেকে সন্ত্রাসবাদী চিন্তাভাবনা বিলুপ্ত হয়নি। আর এ চিন্তা চেতনার একট গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনবিচ্ছিন্নতা। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জনগণের পক্ষে কাজ করা এবং শুধু নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবী তৎপরতার মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে নিযুক্ত হওয়া।[১০০] ফলে **১৯৭১** সালে কমিউনিস্টদের একটা অংশ শ্রেণি শত্রু খতমের লাইন গ্রহণ করেন। আর পুরোনো সন্ত্রাসবাদী চিন্তাচেতনার নবজাগরণ ঘটে এর মধ্য দিয়ে। তাদের মধ্য থেকে চীনপন্থি যারা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত হন স্বাভাবিক কারণেই প্রশাসন তাদের সুনজরে দেখেনি। বাংলাদেশের জনগণ এসময় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পাশাপাশি লড়েছে স্নায়ুযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে। কমিউনিস্ট আন্দোলন এর সাথে ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এর প্রতিফলন ঘটে যুদ্ধের ময়দানে।

কমরেড আব্দুল হক ও তৎকালীন সমস্ত গোপন দলগুলো লড়াইয়ের মাধ্যমে সশস্ত্র পন্থায় ক্ষমতা বিপ্লবের মাধ্যমে দখলের কর্মসূচি গ্রহণ করলে 'বিপ্লবের স্তর' 'রাজনৈতিক চিন্তাধারা' আদর্শ ও পন্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ফলে তত্ত্বগত হেরফের মতাদর্শগত ভিন্নতায় একে অপরের প্রতিবিপ্লবী দালাল বলে পরস্পরকে আখ্যায়িত করে। ফলে তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য গড়ে উঠতে পারেনি।[১০১] পূর্ব পাকিস্তানের উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে বর্বর আক্রমণ পরিচালনা করে তার বিরুদ্ধে চীন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। বরং চীন পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন করে। আর চীনের এ সমর্থনের পেছনে কমিউনিস্ট আন্দোলন বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কমিউনিস্টসুলভ কোনো ব্যাপার ছিল না। চীন সে সময় যে নীতি গ্রহণ করে তা ছিল সম্পূর্ণরূপে তাদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা।[১০২] আর সেই স্বার্থটি ছিল তাইওয়ান। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে চীন সমর্থন করলে তাইওয়ানের স্বাধীনতার

প্রশ্নটি চরমভাবে সামনে আসত। নীতিগত প্রশ্নে চীনাদের সামনে তা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিত। এছাড়া আফ্রো-এশীয় দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাব চীনাদের জন্য শঙ্কার ছিল। আন্তর্জাতিক শক্তির ভারসাম্যের দিকটি বিবেচনা করে চীন পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ সংকট একেবারে গোড়া থেকেই পরাশক্তির ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চলমান দ্বন্দ্বের পাশাপাশি যুক্ত হয় আণবিক শক্তিধর নতুন রাষ্ট্র চীন। স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব এ অঞ্চলের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের নতুন সরকার মস্কোপন্থি নীতি অনুসরণ করবে এবং ভারত আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে। তবে পুরো প্রক্রিয়ায় যতটা প্রাধান্য পেয়েছে চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ ততটা প্রাধান্য পায়নি শোষিত মানুষের মুক্তির বিষয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শগত দিকগুলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিক থেকে শক্তি প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য ছিল না। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুঁজিবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীন সমাজতন্ত্রকে বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে চীন বা সোভিয়েত ইউনিয়ন শোষণের ক্ষেত্রটা বিচার করেনি। যুদ্ধ কার দিক থেকে ন্যায় আর কার দিক থেকে অন্যায় তার বিধান করা কিংবা মার্কস বা লেনিনের তত্ত্বানুসারে তা কোনদিক থেকে সমর্থনযোগ্য তার বিশ্লেষণ করা। সেখানে রাষ্ট্র দুটি সে পথের ধারে কাছেও যায়নি, তারা পুঁজিবাদের ধারক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই ক্ষমতা স্থাপনের অঙ্ক কষেছেন। কোন পক্ষে গেলে কার শক্তি বৃদ্ধি পাবে, কোন পক্ষে গেলে বিশ্বের বুকে নিজের ক্ষমতা অটুট থাকবে, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বজায় থাকবে ইত্যাদি বিষয়গুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। শোষিত-বঞ্চিতের মুক্তির লক্ষে পরিচালিত যে কমিউনিস্ট আন্দোলন তা আর যাই হোক বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রতিফলিত হয়নি। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন তাত্ত্বিকভাবে প্রতিটি দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থনের কথা বলে। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভারতকে ঘামঝরাতে হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোঝাতে। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের যতো গোপন দলিলপত্র প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত কিংবা যুক্তরাষ্ট্র যে

রাষ্ট্রই হোক না কেন বাংলাদেশের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান তৈরিতে কোনো নীতিগত বা আদর্শিক কারণ ছিল অনুপস্থিত। প্রত্যেকে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে কৌশল অবলম্বন করে।

তথ্যসূত্র

১. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, 'বেতিয়াবার যুদ্ধ, বিশেষ গেরিলা বাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবদান', অধ্যাপক অজয় রায় ও শামসুজ্জামন খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড (প্রথম পর্ব), মার্চ ১৯৭১ ডিসেম্বর ১৯৭২, বাংলা একাডেমি, ২০১২, পৃ. ৩১৩।

২. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

৩. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩।

৪. *ঐ*, পৃ. ৩১৫।

৫. ভ্লাদিমি পুচকভ, *বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারা (১৯৭১-১৯৮৫)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮।

৬. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস রিপোর্ট*, ১৯৭৩, পৃ. ২০৫।

৭. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম 'মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের অবদান', শাহীন রহমান (সম্পা.), *আমাদের মুক্তিযুদ্ধ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০১১ পৃ. ৬৮।

৮. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ২১ এপ্রিল ১৯৭১।

৯. অজয় রায়, *বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলন, (১৯৪৭-১৯৭১)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১০৫।

১০. নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০ বছর*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫২।

১১. মণি সিংহ, 'মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫।

১২. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ১২ জুলাই ১৯৭১।

১৩. *ঐ*।

১৪. মণি সিংহ, 'মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি', মেসবাহ কামাল (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

১৫. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল্যায়ন' ১২ মে ১৯৭১ পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি উদ্বৃত হয়েছে মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধের ছিন্ন দলিলপত্র*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৭৭-১৮১।

১৬. 'সংগ্রামী দেশবাসীর প্রতি' - *মুক্তিযুদ্ধ*, পূর্ব পাকিস্তানের (বাঙলাদেশের) কমিউনিস্ট পার্টি'র মুখপত্র, ১ আগস্ট ১৯৭১ ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, উদ্বৃত আছে নূহ-উল-আলম লেনিন, *কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস প্রসঙ্গ ও দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৪-১৯৭১) জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ৬৮০-৬৮২।

১৭. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ৭ আগষ্ট ১৯৭১।

১৮. *ঐ*, ২৭ জুন ১৯৭১।

১৯. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ১ জুলাই ১৯৭১।

২০. *ঐ*, ২ জুলাই ১৯৭১।

২১. বিস্তারিত দেখুন আলতাফ পারভেজ, *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৫।

২২. মহিউদ্দিন আহমদ, *জাসদের উত্থান পতনঃ অস্থির সময়ের রাজনীতি*, প্রথমা, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ৪৮-৫৩।

২৩. মণি সিংহ-এর সাক্ষাৎকার, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র (১৫ খণ্ড)*, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫, পৃ. ৩১৬।

২৪. আলতাফ পারভেজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

২৫. *ঐ*, পৃ. ২১৩।

২৬. তালুকদার মনিরুজ্জামান, (ভাষান্তরঃ মোঃ সাহেব আলী, এ কে এম কুতুবউদ্দিন), *বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৫৮।

২৭. ড. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস: ১৯৭২-২০০০*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৭৫২।

২৮. মোনায়েম সরকার, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস মার্চ-ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

২৯. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস রিপোর্ট* ১৯৭৩, পৃ. ২০৯।

৩০. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক রিপোর্ট*, ৪-৯ ডিসেম্বর, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ০৮।

৩১. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১-৩২৫।

৩২. মহিউদ্দিন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, প্রথমা, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ৫২; পিকিংপন্থিদের সাথে আওয়ামী লীগের দ্বন্দ্ব ছিল ছয় দফাকে কেন্দ্র করে। পিকিংপন্থিরা ছয়দফাকে সিআইএর দলিল বলে প্রচার করে। আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাদের সখ্য ছিল অনেকটা প্রকাশ্য। চীনের পররাষ্ট্রনীতির অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে তারা অনেক ক্ষেত্রে বাঙালির জাতীয় মুক্তির প্রশ্নটিকে শুধু পাশ কাটিয়ে যায়নি এর বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।

৩৩. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ৪ জুলাই ১৯৭১।

৩৪. অজয় রায়, *বাংলাদেশে বামপন্থী আন্দোলন: ১৯৪৭, ১৯৭১*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১০৬।

৩৫. মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১।

৩৬. মনজুরুল আহসান খান, 'মুক্তিযুদ্ধ চলছে', শাহীন রহমান (সম্পা.), *আমাদের*

মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০১১, পৃ. ৪৮।
৩৭. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ২৪ জুন ১৯৭১।
৩৮. *ঐ*, ২১ জুন ১৯৭১।
৩৯. মণি সিংহ, 'মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, গণপ্রকাশী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১১, পৃ. ১৭৮।
৪০. তালুকদার মনিরুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।
৪১. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
৪২. এইচ.টি.ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১২, পৃ. ১৯০-১৯২।
৪৩. *ঐ*।
৪৪. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
৪৫. ড. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭৪।
৪৬. *মুক্তিযুদ্ধ*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।
৪৭. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৯৭৩, পৃ. ২০৭।
৪৮. 'ঐক্যবদ্ধভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানিয়া শত্রুকে পর্যদুস্তকরা যে-স্বাধীনতার বেদীমূলে অগণিত দেশবাসী অকাতরে আত্মবলী দিয়াছেন উহাদের প্রতি বেইমানী বরদাশত করা হইবে না', *মুক্তিযুদ্ধ*, ১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা ১৪ নভেম্বর ১৯৭১।
৪৯. এইচ. টি. ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।
৫০. মোনায়েম সরকার, 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২-২৬৩।
৫১. *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস রিপোর্ট* ১৯৭৩, পৃ. ২১১।
৫২. ১৯৭১ সালের ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (হাতিয়ার গ্রুপ)র কর্মী সম্মেলনে গৃহীত দলের *রাজনৈতিক রিপোর্ট*, পৃ. ১৩-১৫।
৫৩. *ঐ*।
৫৪. হায়দার আকবর খান রনো, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা', মেসবাহ কামাল (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, গণপ্রকাশণী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ. ১৯২।
৫৫. বদরুদ্দীন উমর (সম্পা.), *সংস্কৃতি*, জুন ২০১৬, পৃ. ৫১।
৫৬. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এ আর মীর্জা, *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন*, প্রথমা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১৯।
৫৭. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৫০।
৫৮. বদরুদ্দীন উমর (সম্পা.), *সংস্কৃতি*, জুন ২০১৬, পৃ. ৫২।
৫৯. কমরেড বজলের চিঠি-৪ এপ্রিল ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা.লে)-র সম্পাদকমন্ডলীর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত, *সংস্কৃতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৮।

৬০. নূরুল হাসান, 'নোয়াখালীর রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা', *নতুন দিগন্ত*, পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ২০১৭, পৃ. ১১৯।
৬১. *ঐ*।
৬২. বদরুদ্দীন উমর (সম্পা.), *সংস্কৃতি*, জুন ২০১৬, পৃ. ৫০।
৬৩. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৮৫।
৬৪. *ঐ*, পৃ. ৮৫।
৬৫. হায়দার আকবর খান রনো, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১-৯২।
৬৬. ড. লেনিন আজাদ, 'মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল): পাবনা জেলা শাখার ভূমিকা', মেসবাহ কামাল, (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, গণপ্রকাশী ও সমাজ চেতনা পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১১, পৃ. ২১৪।
৬৭. সাক্ষাৎকার: টিপু বিশ্বাস।
৬৮. *ঐ*।
৬৯. ওহিদুর রহমান, *মুক্তি সংগ্রামে আত্রাই*, সংহতি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৪।
৭০. *ঐ*, পৃ. ৪৫।
৭১. মিজানুর রহমান মিজান, 'মুক্তিযুদ্ধে ওহিদুর বাহিনী', গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা কর্তৃক পরিচালিত 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে রচিত গবেষণাপত্র, ২০১৭, পৃ. ২০।
৭২. *ঐ*।
৭৩. ওহিদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।
৭৪. *ঐ*, পৃ. ৬৫।
৭৫. আলতাফ পারভেজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-২৮৯।
৭৬. ড. হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬৪-৬৫।
৭৭. হায়দার আকবর খান রনো, 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বামপন্থীদের ভূমিকা', মেসবাহ কামাল (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।
৭৮. সাক্ষাৎকার: কাজী জাফর আহমদ, *আমার রাজনীতির ৬০ বছর: জোয়ার, ভাটার কথন*, তরফদার প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ১৩৫।
৭৯. *ঐ*, পৃ. ১৩৭-১৩৮।
৮০. *ঐ*।
৮১. হায়দার আকবর খান জুনো, *আগুনঝরা সেই দিনগুলো*, সংহতি, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১০৩।
৮২. *ঐ*, পৃ. ৯৪।
৮৩. হায়দার আকবর খান রনো, *শতাব্দী পেরিয়ে*, তরফদার প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ২৫৫।
৮৪. *ঐ*, পৃ. ২০৪-২১০।

৮৫. *ঐ*, পৃ. ১৯১-৯২।
৮৬. Navine Murshid, 'India's Role in Bangladesh's War of Independence: Humanitarianism or self-interest?', *Economic and Political Weekly*, vol. 46, no. 52 (December 24, 2011), p. 57.
৮৭. *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা* (কলকাতা), ২ এপ্রিল ১৯৭১।
৮৮. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), শুক্রবার, ২৮ মার্চ ১৯৭১।
৮৯. *ঐ*, ২৪ জুন ১৯৭১।
৯০. সাক্ষাৎকারঃ মানষ ঘোষ (কলকাতা) এবং জয়ন্তকুমার রায় (কলকাতা)।
৯১. ডা. ওমর আলী, 'বাঙলাদেশেঃ সিপিএমঃ সিপিআই,' মুনতাসীর মামুন ও চৌধুরী শহীদ কাদের (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, *ত্রয়োবিংশ খণ্ড*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৮ পৃ. ২২৪।
৯২. *ঐ*।
৯৩. *দৈনিক আজাদ* (ঢাকা), বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন ১৯৭১।
৯৪. *দৈনিক কালান্তর* (কলকাতা), ১১ জুন ১৯৭১।
৯৫. এনায়েত মুন্সী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৬।
৯৬. দেবেন সিকদার, *উপমহাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি*, মুক্তধারা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১২৫।
৯৭. *সাপ্তাহিক জনতা* (ঢাকা), রবিবার ১০ জানুয়ারি ১৯৭১।
৯৮. জ্যোতি দাশগুপ্ত, 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি', পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পরিষদের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত, তারিখ বিহীন।
৯৯. 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন বাঁধা', *দৈনিক গণশক্তি* (কলকাতা), ২০ জুলাই ১৯৭১।
১০০. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের বামপন্থীরা*, সংস্কৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ০৬।
১০১. মনজুরুল হক, *পূর্ব বাংলার সাত দশকের কমিউনিস্ট রাজনীতি*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭৫।
১০২. *সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।